ফেলুদা সমগ্র

দার্জিলিং জমজমাট

সত্যজিৎ রায়

সূচিপত্র

১. লালমোহনবাবু ঘরে ঢুকতেই. 2
২. কাঞ্চনজঙ্ঘা হোটেল 10
৩. সাল্লাইম কথাটা. 17
৪. পুলক ঘোষালের দল 27
৫. পরদিন ব্রেকফাস্ট শেষ করতে না করতে 35
৬. বজ্রপাতটা হল পরের দিন 43
৭. জেরা শেষ. 53
৮. পরিচয় হয়েছিল আমাদের. 60
৯. ফেলুদার জখম 67
১০. দুপুরে লাঞ্চের পর 79
১১. এশিয়াজ বিজিয়েস্ট সিনেমা ডাইরেক্টর 84

১. লালমোহনবাবু ঘরে ঢুকতেই

সুখবর বলে মনে হচ্ছে?

লালমোহনবাবু ঘরে ঢুকতেই ফেলুদা তাঁকে প্রশ্নটা করল। আমি নিজে অবিশ্যি সুখবরের কোনও লক্ষণ দেখতে পাইনি। ফেলুদা বলে চলল, দু বার পর পর বেল টেপা শুনেই বুঝেছিলাম, আপনি কোনও সংবাদ দিতে ব্যগ্র, তবে সেটা সুসংবাদ না দুঃসংবাদ বুঝতে পারিনি। এখন স্পষ্ট বুঝছি সুসংবাদ।

কী করে বুঝলেন? বললেন লালমোহনবাবু, আমি তো হাসিনি।

এক নম্বর, আপনার মাঞ্জা দেওয়া চেহারা; হলদে পাঞ্জাবিটা নতুন, দাড়ি কামিয়েছেন। নতুন ব্লেড দিয়ে, আফটার-শেভ লোশনের গন্ধে ঘর মাতোয়ারা, তারপর আপনি সচরাচর নটার আগে আসেন না; এখন নটা বাজতে সতেরো।

লালমোহনবাবু হেসে ফেললেন। ঠিকই ধরেছেন মশাই! আপনাকে ব্যাপারটা না বলা অবধি সোয়াস্তি পাচ্ছিলাম না। সেই পুলক ঘোষালকে মনে আছে তো?

চিত্র পরিচালক? যিনি আপনার বোম্বাইয়ের বোম্বেটে থেকে হিন্দি ছবি করেছিলেন?

শুধু ছবি নয়, হিট ছবি। তখন থেকেই বলে রেখেছিল ভবিষ্যতে আবার আমার গল্প থেকে ছবি করবে। অ্যাদ্দিনে সেটা ফলেছে।

এটা কোনটা?

সেই কারাকোরামের গল্পটা। অবিশ্যি কারাকেরাম আর নেই; সেখানে হয়ে গেছে। দার্জিলিং।

কোথায় কারাকেরাম, আর কোথায় দার্জিলিং!

তবু নেই মামার চেয়ে তো কানা মামা ভাল মশাই] আর আমার রেটও তো বেড়ে গেছে। অনেক। ফর্টি থাউজ্যান্ড!

বলেন কী? আমার দু বছরের রোজগার।

তা, যেখানে ছাপ্পান্ন লাখ টাকা বাজেট-সেখানে রাইটারকে ফটি থাউজ্যান্ড দেবে না? ওখানে টুপ অভিনেতারা কত পায় জানেন?

তা মোটামুটি জানি বইকী?

তবে? আমার। এ ছবিতে হিরো করছে রাজেন রায়না। সে নিচ্ছে বারো লাখ। আর ভিলেন করছে মহাদেব ভার্মা। এর রেট আরও বেশি। সবে পাঁচখানা ছবি করেছে, কিন্তু পাঁচখানাই সিলভার জুবিলি হিট।

তা, পুলক ঘোষাল আপনার এত পেয়ারের, আপনাকে দার্জিলিং-এ ডাকল না?

সেইটে বলতেই তো আসা! ডাকবে না। মানে? ওর গ্র্যাণ্ডফাদার ডাকবে। আর আমাকে এক নয়, আমাদের তিনজনকেই ডেকেছে। অবিশ্যি আমি বলিচি ইনভিটেশনের দরকার নেই-আমরা এমনিই যাব। কী-ঠিক বলিনি?

শেষ কবে গেছি। দার্জিলিং? মনেই নেই; শুধু এইটুকু মনে আছে যে ফেলুদার গোয়েন্দাগিরির শুরু দার্জিলিং-এ। আমি ছিলাম খুব ছোট, আর ওর নরম-গরম ধমক প্রায়ই শুনতে হত। এখন ফেলুদা আমাকে ওর অ্যাসিস্ট্যান্ট বলে পরিচয় দেয়। তখন সেটা করতে গেলে লোকে হাসত। বেশ কিছু দিন থেকেই মনে হয়েছে যে আবার দার্জিলিং গেলে বেশ হয়, কিন্তু গত পাঁচ-ছ বছরে ফেলুদার পসার বেড়েছে অনেক! সেই সঙ্গে অবিশ্যি রেটও বেড়েছে। আজকাল ওর দিব্যি চলে যায়; গত ছ। মাসে পাঁচটা তদন্ত করতে হয়েছে ওকে। তার মধ্যে চন্দননগরের একটা জোড়া খুনের কেস ছাড়া সব

কটাতেই ও সফল হয়েছে, তারিফ পেয়েছে, পয়সা কমিয়েছে। তিন মাস আগে একটা কালার টি ভি কিনেছে। ও। তা ছাড়া ওর পুরনো বইয়ের শখ, সেই সব বই বিস্তর কিনে ও তাক ভরিয়েছে। এটা আমি বুঝেছি যে ফেলুদা খরুচে লোক। টাকা জমানোর দিকে ততটা আগ্রহ নেই। যা ঘরে আসে তার বেশির ভাগই খরচ হয়ে যায়, আর সেটা যে শুধু নিজের পিছনে, তা নয়। লালমোহনবাবু আমাদের জন্য এত করেন বলে ফেলুদা সুযোগ পেলেই তাঁকে কিছু না কিছু দেয়। আফটার-শেভ লোশনটা ওরই দেওয়া। সেটা স্পেশাল আকেশনে লালমোহনবাবু ব্যবহার করেন। বোঝাই যাচ্ছে আজকে সে রকমই একটা দিন।

সামনে পুজো, ফেলুদা ঠিকই করেছিল মাস কয়েক আর কোনও কাজ নেবে না। কাজেই দার্জিলিং যাওয়ায় তার আপত্তির কোনও কারণ থাকতে পারে না। এমনিতেই দার্জিলিং ওরা খুব প্রিয় জায়গা; ও বলে, বাংলা দেশটা ভারতবর্ষের কটিদেশে হওয়াতে এখানে একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছে-বাংলার উত্তরে হিমালয় আর দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এটা ভারতবর্ষের আর কোনও প্রদেশে নেই। এটা নাকি একটা অ্যাক্সিডেন্ট অফ জিয়োগ্রাফি।এত বৈচিত্র্য আর কোনও একটা প্রদেশে পাবি না, বলে ফেলুদা! শস্য-শ্যামলাও পাবি, রুক্ষতাও পাবি, সুন্দরবনের মতো জঙ্গল পাবি, গঙ্গা পদ্মা মেঘনার মতো নদী পাবি, সমুদ্র পাবি, আবার উত্তরে হিমালয় আর কাঞ্চনজঙ্ঘাও পাবি।

বলুন মশাই, যাবেন কি না, শ্রীনাথের আনা গরম চায়ে চুমুক দিয়ে এক মুঠো চানাচুর মুখে পুরে বললেন লালমোহনবাবু।

দাঁড়ান, আর একটা ডিটেল জেনে নিই।

বলুন কী জানতে চান।

গেলে কবে যাওয়া?

ওদের একটা দল অলরেডি দার্জিলিং পৌঁছে গেছে। তবে আগামী শুক্রবারের আগে কাজ আরম্ভ হচ্ছে না। আজ হল রবি।

শুটিং দেখার ব্যাপারে আমার তেমন কোনও উৎসাহ নেই। কাজটা কি মাঠে-ঘাটে হচ্ছে, না বাড়ির ভিতর?

বিরূপাক্ষ মজুমদারের নাম শুনেছেন?

বেঙ্গল ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর?

ছিলেন, ঐখন আর নেই। একটা মাইল্ড সেরিব্রাল ষ্ট্রোকের পর বাহান্ন বছর বয়সে রিটায়ার করেন।

তা ছাড়া ওঁর তো আরও অনেক গুণাপনা আছে না? ভদ্রলোক স্পোর্টসম্যান ছিলেন তো।

এককালে ভারতবর্ষের বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়ন ছিলেন। শিকারও বোধহয় করতেন।

ওঁর একটা শিকারকাহিনী একটা পত্রিকায় পড়েছি।

খুব বড় ফ্যামিলির ছেলে। এঁর পূর্বপুরুষ পূর্ববঙ্গে নয়নপুরের জমিদার ছিলেন। দার্জিলিং-এ ওঁদের একটা পুরনো বাড়ি আছে। একতলা বাংলো টাইপের ছড়ানো বাড়ি, ষোলটা ঘর। বিরূপাক্ষ মজুমদার রিটায়ার করার পর সেখানে গিয়েই থাকেন। ওঁদের বাড়ির দুখানা ঘরে কিছু শুটিং হবে। পারমিশন হয়ে গেছে। বাকি শুটিং বাইরে নানান জায়গায় ছড়িয়ে। এরা মাউন্ট এভারেস্ট হোটেলে রয়েছে। আমরা অন্য কোনও হোটেলে

থাকতে পারি।

সেই ভাল; ফিল্ম পার্টির সঙ্গে অতিরিক্ত মাখামাখিটা আমার পছন্দ হয় না। দার্জিলিং-এ ইদানীং অনেক নতুন হোটেল হয়েছে। তার একটাতে থাকলেই হল।

আমি বললাম, হোটেল কাঞ্চনজঙ্ঘার একটা বিজ্ঞাপন দেখেছি কাগজে।

ঠিক বলেছিস, বলল ফেলুদা। আমিও দেখেছি।

তা হলে আর কী, বললেন লালমোহনবাবু, ব্যবস্থা করে ফেললেই হয়।

ব্যবস্থা তিন দিনের মধ্যেই হয়ে গেল।

বিষ্যুদবার ত্রিশে সেপ্টেম্বর দুপুরে এয়ারপোর্টে গিয়ে দেখি, আমাদের সঙ্গে পুলক ঘোষালও চলেছেন। আর সে-সঙ্গে চলেছে ছবির হিরো, হিরোইন আর ভিলেন। লালমোহনবাবুর গল্পে কোনও হিরোইন ছিল না; সেটা বুঝলাম এঁরা ঢুকিয়েছেন। পুলক ঘোষাল ফেলুদাকে দেখে এক গাল হেসে বললেন, লালুদার গল্প হওয়াতে আবার আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ভেরি লাকি। তবে আশা করি, আগের বারের মতো এবারও আপনাকে তদন্তে জড়িয়ে পড়তে হবে না।

পুলক ঘোষাল হিরো রাজেন্দ্র রায়না, হিরোইন সুচন্দ্রা আর ভিলেন মহাদেব ভার্মার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। সুচন্দ্রাকে দেখতে ভাল, তবে রং একটু বেশি মেখেছেন, রাজেন রায়নার ছবি আমি আগেই দেখেছি।-বেশ স্মার্ট, হাসিখুশি ভদ্রলোক, একটু দাড়ি আছে বেশ ছোট করে আর যত্ন করে ছাঁটা, লম্বায় ফেলুদাররি মতো, আর শরীরটাকেও বেশ ফিট বলেই মনে হল। ইনি নবাগত হলেও বয়স অন্তত চল্লিশ তো হবেই; তবে সেটা মেক-আপ নিলে ক্যামেরায় আর ধরা পড়বে বলে মনে হয় না। লালমোহনবাবু ওঁর হিরো প্রখর রুদ্রের যে বর্ণনা দিয়েছেন-লিস্বয় সাড়ে ছ। ফুট, পঞ্চাশ ইঞ্চি ছাতি, খাঁড়ার মতো নাক, আর চোখ দেখলে মনে হয় যেন আগুন জ্বলছে—সে-রকম চেহারার কোনও অভিনেতা কোনও দেশে আছে বলে আমার জানা নেই।

আমার সবচেয়ে ইস্টারেস্টিং লাগল। মহাদেব ভার্মাকে। ইনি হলেন যাকে ইংরেজিতে বলে পালিশ করা ভিলেন। চোখ দুটো ঢুলু ঢুলু, ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি, ন্যাকের নীচে সরু চাড়া-দেওয়া গোঁফ, দেখে মনে হয় প্রয়োজনে খুন করতে কিছুমাত্র দ্বিধা করবেন না। তার উপর দেখলাম ভদ্রলোক পারফিউম ব্যবহার করেছেন, তাতে বোঝা যায় ইনি শৌখিনও

বটে। পারফিউম অবিশ্যি রাজেন্দ্র রায়নাও মেখেছেন, তবে তার গন্ধ অন্য। ফেলুদা পরে বলেছিল যে মহাদেব ভার্মাির সেন্টটা হচ্ছে ড়েনিম, আর প্লায়নারটা হল ইয়ার্ডলি ল্যাভেন্ডার।

এয়ারপোর্টেই লাউড স্পিকারে বলল যে বাগডোগরার প্লেন এক ঘণ্টা লেট আছে। তাই আমরা সকলেই রেস্টোরান্টে চা-কফি খেতে চলে গেলাম। এ ব্যবস্থাটা অবিশ্যি পুলক ঘোষালই করলেন, আর আমরা তাঁর অতিথি হয়েই গেলাম।

রেস্টোরান্টে মহাদেব ভার্মার সঙ্গে ফেলুদার কথা হল। আমি ফেলুদার পাশেই বসেছিলাম, তাই সব কথাই শুনতে পেলাম।

ফেলুদাই প্রথম শুরু করল, বলল, আপনি তো বোধহয় কয়েক বছর হল এ লাইনে এসেছেন?

ভার্মা বললেন, হ্যাঁ, সবে তিন বছর হয়েছে। তার আগে আমার ছিল ভ্রমণের নেশা। ভারতবর্ষের বহু জায়গায় ঘুরেছি; এমনকী বছর পাঁচেক আগে লে-লাদাক পর্যন্ত ঘুরে এসেছি। সেখান থেকে যাই কাশ্মীর। শ্রীনগরে একটা শুটিং হচ্ছিল, সেই ছবির পরিচালকের সঙ্গে ঘটনাচক্রে পরিচয় হয়; তিনিই আমাকে ছবিতে আফগার দেন। এখন অবিশ্যি আর ফিল্ম ছাড়ার কথা ভাবাই যায় না।

লালমোহনবাবু কিছুক্ষণ থেকেই উসখুসি করছিলেন, এবার তাঁর প্রশ্নটা করে ফেললেন।

আপনি যে চরিত্রটা করছেন, সেটা আপনার কেমন লাগল?

খুব জোরদার চরিত্র, বললেন মহাদেব ভার্মা।বিশেষ করে আমি যেখানে হিরোইনকে আমার সামনে ধরে হিরোর প্রতি বাক্যবাণ নিক্ষেপ করছি, আর হিরো হাতে রিভলভার নিয়েও কিছু করতে পারছে না, সে দৃশ্যটা সত্যি নাটকীয়।

অবিশ্যি এমন কোনও দৃশ্য বইয়ে নেই। লালমোহনবাবুর মুখের হাসিটা তাই কেমন যেন শুকিয়ে গেল।

এবার মহাদেব ভার্মা ফেলুদাকে একটা প্রশ্ন করলেন।

আপনি তো গোয়েন্দা বলে শুনলাম। তা গোয়েন্দারা তো শুনেছি, একজন মানুষকে দেখেই তার বিষয়ে অনেক কিছু বলে দিতে পারেন। আপনি আমাকে দেখে কিছু বলুন তো দেখি।

ফেলুদা হেসে বলল, গোয়েন্দারা অবশ্যই জাদুকর নন। তাঁরা যেটুকু বোঝেন তার কিছুটা পর্যবেক্ষণের জোরে, আর কিছুটা মনস্তত্ত্বের সাহায্যে। এ দুটোর ভিত্তিতে এটুকু বলতে পারি যে আপনি কিছুটা নিরাশ বাধ করছেন।

কেন?

কারণ আপনি প্রায়ই কথা বলতে বলতে এদিক-ওদিক দেখছেন আর বেশ বুঝতে পারছেন যে, এই লোক-ভর্তি রেস্টোরান্টে আপনাকে অনেকেই চিনতে পারছে না। একটু আগেই লক্ষ করলাম যে, আপনি চারপাশে চোখ বুলিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। অথচ হিরো রাজেন্দ্র রায়নাকে অনেকেই চিনেছে, অনেকেই এগিয়ে এসে তার অটাগ্রাফ নিয়েছে। শেষে দেখলাম, আপনি আপনার কালো চশমাটা খুলে টেবিলের উপর রাখলেন, যদি তার ফলে কেউ চেনে; কিন্তু তাতেও কোনও ফল হল না দেখে আপনি আবার চশমাটা পরে নিলেন।

মহাদেব ভার্মা এবার আর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আপনি হান্ড্রেড পারসেন্ট ঠিক বলেছেন। বম্বেতে আমাকে পাবলিক প্লেসে দেখলে রীতিমতো হই-চই পড়ে যায়। আপনাদের বাঙালিরা বোধহয় বেশি হিন্দি ছবি দেখেন না।

যথেষ্ট দেখেন, বললেন লালমোহনবাবু, কিন্তু আপনার তিনখানা ছবি এখনও এখানে রিলিজ হয়নি। অবিশ্যি আমি যে সিনেমার খুব খবর রাখি তা নয়, তবে আমার গল্পে যিনি ভিলেনের পার্ট করছেন, তাঁর বিষয়ে গত ক দিনে কিছু খোঁজ-খবর নিচ্ছিলাম ফিল্ম পত্রিকাগুলো থেকে।

আই সি, খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে বললেন মিঃ ভার্মা! যাই হোক, মিঃ মিত্তিরের অবজারভেশন যে দারুণ শার্প, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

ফেলুদার পর্যবেক্ষণ শক্তির পরীক্ষা অবিশ্যি দার্জিলিং-এ খুব ভালভাবেই হয়েছিল, কিন্তু সে কথা, যাকে বলে, যথাস্থানে বলব। আপাতত প্লেন এসে গেছে, আমাদের ডাক পড়ে গেছে, তাই উঠে পড়তে হল। এখন সিকিউরিটি খুব কড়া, আমি জানি ফেলুদা তাই তার কোল্ট রিভলভারটা সুটকেসে চালান দিয়েছে, সেটা ইতিমধ্যে আমাদের অন্য মালের সঙ্গে প্লেনে উঠে গেছে। আজকাল ফেলুদা আর কোনও রিস্ক নেয় না; স্রেফ ছুটি ভোগ করতে গিয়েও তাকে এত বার তদন্তে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে যে, ও রিভলভার ছাড়া কোথাও যায় না।

সিকিওরিটি থেকে লাউঞ্জে গিয়ে বসার দশ মিনিটের মধ্যেই ডাক পড়ল-দ্য ফ্লাইট টু বাগডোগরা ইজ রেডি ফর ডিপারচার। আমরা তিনজন আর সেই সঙ্গে শুটিং-এর দল, প্লেনে গিয়ে উঠলাম। এখন আমরা সমতল ভূমিতে, কিন্তু আর মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই উঠে যাব ৬০০০ ফুট উঁচুতে। অক্টোবরে দার্জিলিং-এ বেশ ঠাণ্ডা, ভাবতেই মনটা নেচে উঠছে। আমি যেন দেখতে পাচ্ছি যে সামনে অ্যাডভেঞ্চার আছে, যদিও সেটা ফেলুদাকে বলায় ও দাবিড়ানি দিয়ে বলে দিল, তার কোনও ইঙ্গিত এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি, কাজেই তোর

আশা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

এর পরে আর আমি ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছু বলতে যাইনি।

২. কাঞ্চনজঙ্ঘা হোটেল

কাঞ্চনজঙ্ঘা হোটেলটা দিব্যি ছিমছাম। ঘরে ঘরে টেলিফোন, হিটার, স্নানের ঘরে ঠাণ্ডা-গরম জলের ব্যবস্থা, বিছানার চাদর, বালিশ পরিষ্কার-মোট কথা সব কিছু দেখে মনটা যাকে বলে বেশ প্রসন্ন হয়ে গেল। দিন দশেকের জন্য এসেছি, তাই থাকার ব্যবস্থাটা মোটামুটি ভাল না। হলে মনটা খুঁতখুঁত করে।

পথে কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি। সোনাদা এলে পর লালমোহনবাবু তাঁর রাজস্থান থেকে কেনা। কান-ঢাকা চামড়া আর পশমের টুপিটা মাথায় চাপিয়ে নিলেন। পথের দুধারে পাহাড়ের দৃশ্য দেখে উনি কতবার যে বা বলেছেন, তার হিসেব নেই। শেষটায় কার্সিয়ং রেলওয়ে রেস্টোরান্টে চা খাবার সময় ভদ্রলোক সত্যি কথাটা বলে ফেললেন। সেটা হল এই যে, তিনি এই প্রথম দার্জিলিং-এ চলেছেন।

ফেলুদার চোখ কপালে উঠে গেল।

সে কী আপনি এখনও কাঞ্চনজঙ্ঘাই দেখেননি?

নো সার। একগাল হেসে জিভ কেটে বললেন লালমোহনবাবু।

ইস্–আপনাকে প্রচণ্ড হিংসে হচ্ছে।

কেন?

প্রথমবার কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার যে কী অদ্ভুত অনুভূতি, সেটা তো আমাদের মধ্যে একমাত্র আপনিই বুঝবেন! ইউ আর ভেরি লাকি, মিস্টার গাঙ্গুলী।

আকাশ পরিষ্কার থাকলে কার্সিয়ং থেকেও কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়, কিন্তু আজ মেঘলা। ঘুম যখন পৌঁছলাম তখন আলো পড়ে আসছে, আর তখনও মেঘ কাটেনি? মোট কথা

লালমোহনবাবুর ভাগ্যে ব্যাপারটা এখনও ঘটেনি। এটা অবিশ্যি দার্জিলিং-এর বিখ্যাত ঘটনা। এমনও হতে পারে যে এই দশ দিনের এক দিনও কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাবে না। তা হলে অবিশ্যি খুবই খারাপ হবে। আমি নিজে এর আগে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখে থাকলেও আবার নতুন করে দেখার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি। এই একটা দৃশ্য, যা কোনও দিনও পুরনো হবার নয়।

হোটেলে জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখে আমরা তিনজনে বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের হোটেল থেকে মিনিট পাঁচেক খাড়াই উঠেই ম্যাল। যখন পৌছলাম, তখন দোকানের আর রাস্তার আলোগুলো জ্বলে উঠেছে। লালমোহনবাবু বললেন, কী ব্যাপার মশাই, গাড়িটাড়ি দেখছি না কেন? ফেলুদাকে বুঝিয়ে দিতে হল, দার্জিলিং-এর বেশ খানিকটা অংশে গাড়ি চলা নিষিদ্ধ। ম্যালটা হল সে রকম একটা জায়গা। এখানে শুধু হাঁটা চলে আর ঘোড়ায় চড়া চলে। আপনি ঘোড়ায় চড়েছেন কখনও? জিজ্ঞেস করল ফেলুদা।

নাঃ, বললেন লালমোহনবাবু। তবে উটেই যখন চড়া আছে, তখন ঘোড়া তো তার কাছে নস্যি।

আগেই বলেছি যে বিরূপাক্ষ মজুমদার বলে একজনের বাড়িতে শুটিং হবার কথা আছে।

আশ্চর্য এই যে, প্রথম দিনই ম্যালে এসে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল! সেটা হল। পুলক ঘোষালের মারফত। শুটিং পার্টি ম্যালে বেড়াতে বেরিয়েছে, পুলক ঘোষাল একবার আগেই দার্জিলিং এসে বিরূপাক্ষ মজুমদারের বাড়ি দেখে পছন্দ করে গেছেন, ভদ্রলোকও কোনও আপত্তি করেননি। ফেলুদাকে দেখেই পুলকবাবু এগিয়ে এলেন, তাঁর সঙ্গে একজন ফেল্ট হ্যাঁট আর সুট পরা ভদ্রলোক।

এঁর বাড়িতেই আমরা শুটিং করছি, বললেন পুলকবাবু, ইনি হলেন মিস্টার বিরূপাক্ষ মজুমদার।

তার পর পুলকবাবু আমাদের তিন জনের পরিচয় দিয়ে দিলেন ভদ্রলোককে। আপনার সঙ্গে শুটিং-এর কী সম্পর্ক? ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করলেন মিঃ মজুমদার। ফেলুদা বলল, আমার কোনও সম্পর্ক নেই, তবে আমার এই বন্ধুটি একজন বিখ্যাত রহস্য-রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক। এরই একটি গল্প থেকে ছবিটা হচ্ছে।

বাঃ, ভেরি গুড! ইনি ক্রাইম রাইটার, আর আপনি গোয়েন্দা–ভেরি গুড! প্রদোষ মিত্র নামটা তো জানা বলে মনে হচ্ছে। আপনার নাম তো কাগজে বেরিয়েছে কয়েকবার, তাই ন্ম?

আজ্ঞে হ্যাঁ, বলল ফেলুদা।গত বছর বাসপুকুরে একটা খুনের ব্যাপারে আমি কিছুটা সাহায্য করেছিলাম।

দ্যাট্স রাইট, বলে উঠলেন ভদ্রলোক, তাই চেনা চেনা লাগছিল। আমার আবার একটা বাতিক আছে; আমি খবরের কাগজের খবর সংগ্রহ করি। আমার সতের বছর বয়স থেকে এই হবি। সব খবর নয়, যাকে বলা যায় একটু গরম খবর। একত্রিশটা খণ্ড হয়েছে সেই খবরের খাতার। এখন তো রিটায়ার করেছি; মাঝে মাঝে সেই সমস্ত পুরনা খাতার পাতা উলটে উলটে দেখি। লোকে গল্পের বই পড়ে, আর আমি পুরনা খবর পড়ি। এখন অবিশ্যি আমার একজন হেলপার হয়েছে। রজত–আমার সেক্রেটারি-আমার কাটিংগুলো খাতায় সেঁটে দেয়। আপনার কাটিংও আছে তার মধ্যে।

আমরা কথা বলতে বলতে এগিয়ে গিয়েছিলাম ম্যালের মুখে ফোয়ারাটা ছাড়িয়ে মেন রোডের দিকে। মিঃ মজুমদার বললেন, আমার একটা ওষুধ ফুরিয়ে গেছে, কেনা দরকার। চলুন না। ওই কেমিস্টের দোকানে।

আমরা গিয়ে দোকানে ঢুকলাম। ভদ্রলোক টিফানিল নামে রাংতায় মোড়া একত্রিশটা বড়ি কিনলেন। বললেন, এ হল অ্যান্টি-ডিপ্রেসান্ট পিলস্–আমার এক মাসের স্টক। রোজ একটি করে না খেলে আমার ঘুম হয় না।

দোকান থেকে বেরিয়ে এসে ফেলুদা বলল, এক'দিন গিয়ে আপনার খাতাগুলো একটু দেখব।

একশোবার বললেন ভদ্রলোক।ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম। এও আপনাকে দেখিয়ে দেব যে, এখনও কিনারা হয়নি এমন পুরনা তদন্তের খবরও আমার খাতায় সাঁটা আছে। আমি বলছি প্রায় বিশ বছর আগের কথা।

খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার তো। বলল ফেলুদা।

অবিশ্যি আমার নিজের জীবনটাও কম ইন্টারেস্টিং নয়, বললেন ভদ্রলোক। এক এক সময় ইচ্ছে করে আত্মজীবনী লিখি, কিন্তু তার পরেই মনে হয়—সবগুলো সত্যি কথা তো লিখতে পারব না। আত্মজীবনী লিখতে গেলে কোনও কিছুই গোপন রাখা উচিত নয়। অন্তত আমার তাই বিশ্বাস। যাক গে—এক'দিন আসবেন।

কোন সময় গেলে আপনার ব্যাঘাত হবে না?

দ্য বেস্ট টাইম ইজ ইন দ্য মর্নিং। আমি বিকেলে একটু ঘুরতে বেরোই। মাউন্ট এভারেস্ট হোটেল ছাড়িয়ে একটু গেলে বাঁয়ে একটা রাস্তা পাবেন যেটা পাহাড়ের গা বেয়ে ওপরে উঠে গেছে। সেটা দিয়ে কিছু দূর গেলেই দেখবেন, গেটে নয়নপুর ভিলা লেখা একটা বাগানে ঘেরা বাংলো। সেটাই আমার বাড়ি।

ভদ্রলোক হাত তুলে গুড বাই করে এগিয়ে গিয়ে একটা ঘোড়ায় চাপলেন, সঙ্গে একজন সহিস। ফেলুদা বলল, রুগি মানুষ, খাড়াই ওঠা বারণ, তাই নিশ্চয়ই ঘোড়া ব্যবহার করেন। তবে বেশ লোক, তাতে সন্দেহ নেই।

শুটিং পার্টির সকলে এ-দোকান সে-দোকান ঘুরে দেখছে, পুলকবাবু এগিয়ে এসে বললেন, মজুমদার মশাইকে কেমন লাগল?

খুব ভাল, বলল ফেলুদা।অসুখ হলে কী হবে, এখনও বেশ তাজা আছেন।

আর সব ব্যাপারে ইন্টারেস্ট। শুটিং-এর বিষয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করছিলেন।

উনি ছাড়া আর কে থাকেন ওঁর বাড়িতে?

ওর সেক্রেটারি আছেন, রজত বোস। এ ছাড়া জনা তিনেক চাকর, মালী আর সহিংস আছে। ভদ্রলোক বিপত্নীক। ওঁর ছেলে আসছেন কলকাতা থেকে। অন্তত আসার তো কথা। একটিই ছেলে। মেয়ে আছে দুটি, তাদের বিয়ে হয়ে গেছে। তারা কলকাতায় থাকে না।

ভদ্রলোকের হবিটা কিন্তু খুব চিত্তাকর্ষক।

কাটিং জমানোর কথা বলছেন?

হ্যাঁ। অনেকটা আমাদের সিধুজ্যাঠার কথা মনে পড়ছে।

আমারও যে তা মনে হয়নি তা নয়, তবে সিধুজ্যাঠা শুধু খুনখারাপির খবরই জমান না; ইন্টারেস্টিং খবর হলেই সেটা সেঁটে রাখেন।

কথা আর বেশি দূর এগোল না। পুলকবাবু বললেন শুটিং-এর অনেক তোড়জোড় আছে, এবার হোটেলে ফিরতে হবে। আগামীকাল নাকি খুব হালকা আউটডোরের কাজ রাখা হয়েছে; তার পরদিন থেকে আর্টিস্ট নিয়ে কাজ শুরু হবে, আর প্রথমেই বিরূপাক্ষ মজুমদারের বাড়িতে কাজ।

দোকানের খোলা ছাতে বসে। হট চকোলেট খেলাম। লালমোহনবাবু খুব তৃপ্তি সহকারে চকোলেটে চুমুক দিয়ে বললেন, মশাই, আমার মন কিন্তু একটা কথা বলছে।

কী বলছে?

বলছে এ যাত্রা বৃথা যাবে না।

বৃথা কেন যাবে? দার্জিলিং-এ এসেছি। চেঞ্জে, এমন চমৎকার ক্লাইমেট, বৃথা কখনও যেতে পারে? পালিউশন-ফ্রি আবহাওয়া—শরীর সারতে বাধ্য।

আমি সেদিক দিয়ে বলছি না, একটা বিজ্ঞ হাসি হেসে বললেন জটায়ু।

তবে কোন দিকে দিয়ে বলছেন?

আমি আপনার পেশার কথা ভাবছি।

আমার পেশা?

আমার মন কেন জানি বলছে যে, আপনাকে কাজে লেগে পড়তে হবে।

ফেলুদা একটা চারমিনার ধরিয়ে বলল, আসলে মুশকিলটা করছে আমার পেশা নয়, আপনার পেশা। আপনার স্বভাবই হল অলিতে-গলিতে রহস্যের গন্ধ পাওয়া। অবিশ্যি যদি তেমন কিছু ঘটেই বসে, গড ফরবিড়, তা হলে ফেলুমিত্তির হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না এটা এই তো চাই!

এই তো এ. বি. সি. ডি.-র পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত মনোভাব!

এইখানে বলে রাখি, এ. বি. সি. ডি. হল ফেলুদাকে দেওয়া লালমোহনবাবুর খেতাব। এর মানে হল এশিয়াজ ব্রাইটেস্ট ক্রাইম ডিটেক্টর। কাজেই উনি ফেলুদাকে মাঝে মাঝে এ. বি. সি. ডি. বলে সম্বোধনও করে বসেন।

আমি জানি না, কিন্তু বিরূপক্ষ মজুমদারের সঙ্গে যেটুকু আলাপ হল, তাতে আমারও ভদ্রলোককে বেশ রহস্যজনক চরিত্র বলে মনে হল। বছরের পর বছর প্রায় একাই দার্জিলিং-এ পড়ে আছেন। খাতায় গরম গরম খবর সাঁটছেন, আর পুরনো খবর পড়ে দেখছেন; অবিশ্যি তার মানেই যে তাকে ঘিরে কোনও ক্রাইম ঘটবে, সেটা ভাবার কোনও যুক্তি নেই। আসল কথাটা হচ্ছে কী-ফেলুদা চেঞ্জে গেলেও সেখানে শেষ পর্যন্ত তাকে

গোয়েন্দার ভূমিকা নিতে হয়, এটা এতবার দেখেছি যে, মন বলছে এবারও সেটা না হয়ে যায় না।

৩. সাব্লাইম কথাটা

সাব্লাইম কথাটা লালমোহনবাবুকে এই প্রথম ব্যবহার করতে শুনলাম। অবিশ্যি শুধু সাব্লাইম নয়, তার সঙ্গে স্বগীয়, হেভেনলি, অপার্থিব অনির্বাচনীয় ইত্যাদি বিশেষণ ব্যবহার করে এথিনিয়াম ইস্কুলের কবি মাস্টার বৈকুণ্ঠ মল্লিকের লেখা একটি ছ। লাইনের কবিতা আবৃত্তি করে ফেললেন ভদ্রলোক। ঘটনা আর কিছুই না, দ্বিতীয় দিন ভোরে উঠে। ভদ্রলোক তাঁর ঘরের জানালায় দাঁড়িয়েই দেখেন যে সামনে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছে, আর তাতে সবে সূর্যের গোলাপি রঙের ছোপ পড়তে শুরু করেছে। সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক আমাকে ঘুম থেকে তুলে এনে তার পাশে দাঁড় করালেন। বললেন, এ জিনিস কারুর সঙ্গে শেয়ার না করলে মজাই নেই। আর তার পরেই বিশেষণের তোড়, আর সব শেষে উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করা কবিতা-~

অয়ি কাঞ্চনজঙ্ঘে!
দেখেছি তোমার রূপ উত্তরবঙ্গে
মুগ্ধ নেত্রে দেখি মোরা তোমারে প্রভাতে
সাঁঝেতে আরেক রূপ, ভুল নেই তাতে-
তুষার ভাস্কর্য তুমি, মোদের গৌরব
সবে মিলে তোমারেই করি মোরা স্তব।

আবৃত্তি শেষ করে দম নিয়ে বললেন, সম্বোধনে আ-কারটা এ-কার হয়ে যায়-সেটাকে কীভাবে কাজে লাগিয়েছেন কবি, দেখছি তপেশ?

আমি মাথা নেড়ে বললাম, দেখেছি, যদিও সংস্কৃত ব্যাকরণটা ভাল জানা নেই বলে ভদ্রলোক ঠিক বলছেন না ভুল বলছেন, সেটা বুঝতে পারলাম না।

এটাই গ্রেট পোয়েটের লক্ষণ, বললেন লালমোহনবাবু।

ফেলুদাও অবিশ্যি কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখেছিল, তবে সেটা হোটেলের বাইরে থেকে। ও ভোরে উঠে যোগব্যায়াম সেরে আমি ওঠার আগেই বেরিয়ে পড়েছিল। তার পর ম্যাল থেকে অবজারভেটারি হিলের চারিদিকে চক্কর মেরে চায়ের ঠিক আগে ফিরে এসেছিল। বলল, যতবার কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখি, ততবার বয়সটা যেন কিছুটা কমে যায়। আর সবচেয়ে ভাল কথা–যেখানে–সেখানে বাড়ি উঠে শহরটার অনেক ক্ষতি করলেও অবজারভেটরি হিলের রাস্তাটার কোনও পরিবর্তন হয়নি।

আমারও আজ প্রথম মনে হল যেন জন্ম সার্থক, বললেন লালমোহনবাবু।

যাক! বলল ফেলুদা।এত গাঁজাখুরি গল্প লিখেও যে আপনার সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো টিকে আছে, সেটা জেনে খুব ভাল লাগল।

আজি তা হলে আমরা কী করছি?

আমরা হোটেলের ডাইনিং রুমে ব্রেকফাস্ট করছিলাম; ফেলুদা কাঁটা দিয়ে ওমলেটের খানিকটা অংশ মুখে পুরে বলল, আজ সকালে একবার মজুমদার মশাইয়ের ওখানে যাবার ইচ্ছে আছে। কাল থেকে ওঁর বাড়িতে শুটিং আরম্ভ হয়ে যাবে, তখন বড্ড ভিড়। আজ মনে হয় নিরিবিলি বসে একটু কথা বলা যাবে। এমন লোককে কালটিভেট করাটা আমি কর্তব্যের মধ্যে ধরি।

তথাস্তু, বললেন লালমোহনবাবু।

আমরা সাড়ে আটটায় বেরিয়ে পড়লাম। ম্যাল থেকে নেমে দাশ স্টুডিয়ো আর কেভেনটারের পাশ দিয়ে নেহরু রোড ধরে সোজা তিন কোয়াটার মাইল গেলে মাউন্ট এভারেস্ট হোটেল। সেটা ছাড়িয়ে গেলেই পাব আমরা মিঃ মজুমদারের বাড়ির রাস্তা।

সেই রাস্তা ধরে কিছু দূর উঠতেই একজন বাঙালি ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করতে উনি বলে দিলেন যে, আর মিনিট খানেক হাঁটলেই আমরা নয়নপুর ভিলাতে পৌঁছে যাব।

বাড়ি খুঁজে পেতে কোনওই অসুবিধা হল না। লাল টালির ছাদওয়ালা কাঠের বাংলো বাড়ি, বেশ ছড়ানো, তিন দিক ঘিরে রয়েছে সুন্দর বাগান, আর পিছনে পুব দিকে ঝাউবনের পরেই উঠেছে খাড়াই পাহাড়।

বাগানে একটা মালী কাজ করছিল, সে আমাদের দেখেই এগিয়ে এল।

মিঃ মজুমদার আছেন? জিজ্ঞেস করল ফেলুদা।

কী নাম বলব?

বলো যে, কাল যাঁর সঙ্গে সন্ধ্যায় আলাপ হয়েছিল, সেই মিত্তিরবাবু দেখা করতে এসেছেন।

মালী খবর দিতে চলে গেল। আমি অবাক হয়ে বাড়িটার শোভা দেখছিলাম। উত্তরে চাইলেই সোজা কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছে। এখন ঝলমলে রুপোলি। যিনিই বাড়িটা বানিয়ে থাকুন, তাঁর রুচির তারিফ করতে হয়।

মালীর পিছন পিছন দেখি, মিঃ মজুমদার নিজে বেরিয়ে এসেছেন।

গুড মর্নিং! আসুন আসুন, ভিতরে আসুন!

আমরা তিনজন বাড়ির নাম লেখা সাদা কাঠের গেট খুলে ভিতরে এগিয়ে গেলাম। ভদ্রলোক এককালে বেশ সুপুরুষ ছিলেন, সেটা দিনের আলোতে দেখে বুঝতে পারছি। দেখে অসুস্থ বলে মনেই হয় না। মিঃ মজুমদারের সঙ্গে আর একজন ভদ্রলোক বেরিয়ে এসেছিলেন, জানলাম। তিনিই হলেই সেক্রেটারি রজত বসু। খয়েরি ট্রাউজারের উপর গাঢ় নীল পোলো-নেক পুলোভার পরেছেন, মাঝারি হাইট, রং বেশ পরিষ্কার।

আমাদের বৈঠকখানায় নিয়ে গেলেন মিঃ মজুমদার। আমরা ভাগাভাগি করে দুটো সোফায় বসলাম। ঘরের এক পাশে একটা কাচের আলামারিতে গুচ্ছের ছোট-বড় রুপের কাপ

সাজানো রয়েছে। বোঝা যায় সেগুলো মিঃ মজুমদার নানান সময়ে নানান স্পোর্টস প্রতিযোগিতাতে পেয়েছেন। মাটিতে একটা লেপার্ডের ছাল, আর দেয়ালে দুটো হরিণ আর একটা বাইসনের মাথাও দেখলাম।

আজ সন্ধ্যায় আমার ছেলে সমীরণ আসবে, বললেন বিরূপাক্ষ মজুমদার। 'বাপ-ছেলের মধ্যে কোনও মিল খুঁজে পাবেন বলে মনে হয় না। সে ব্যবসাদার, শেয়ার মার্কেটে ঘোরাঘুরি করে।

তিনি কি ছুটিতে আসছেন, না কোনও কাজে?

সাতদিনের ছুটিতে। অন্তত বলছে তো তাই, তবে ও চুপচাপ বসে ছুটি ভোগ করার ছেলে নয়। ভয়ানক ছটফট। ত্রিশ হতে চলল, এখনও বিয়ে করেনি। আর কবে করবে জানি না। যাকগে—এখন আপনাদের কথা বলুন!

আমরা বরং আপনার কথা শুনতে এসেছি, বলল ফেলুদা।

আমার কথার তো শেষ নেই বললেন মিঃ মজুমদার। আই হ্যাভ লেড এ ভেরি কালারফুল লাইফ। অবিশ্যি পরের দিকে সেটল করে গিয়েছিলাম। একটা ব্যাঙ্কের পুরো দায়িত্ব এসে পড়ে আমার ঘাড়ে। স্বভাবতই তখন অনেকটা সামলে নিতে হয়। তরুণ বয়সটা-শুধু তরুণ কেন, প্রায় চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত-খুব হই-হুল্লোড় করেছি। খেলাধুলো, আউটডোর-ইনডোর, শিকার, কিছুই বাদ দিইনি ।

আর তার সঙ্গে আপনার কাটিং জমানোর হবি।

হ্যাঁ, সেটা কখনও বাদ পড়েনি। রজত আপনাকে একটা নমুনা দেখিয়ে দেবে।

ভদ্রলোক সেক্রেটারির দিকে ইঙ্গিত করাতে তিনি উঠে গিয়ে ভিতরের ঘর থেকে একটা মোটা বড় খাতা এনে ফেলুদার হাতে দিলেন। আমি আর লালমোহনবাবু উঠে গিয়ে ওর পাশে দাঁড়ালাম।

বিচিত্র খাতা, তাতে সন্দেহ নেই।

আপনি দেখছি লন্ডনের কাগজ থেকেও কাটিং রেখেছেন, বলল ফেলুদা।

হ্যাঁ, বললেন বিরূপাক্ষ মজুমদার। লন্ডনে আমার এক ডাক্তার বন্ধু আছে। তাকে বলাই আছে-কোনও সেনসেশনাল খবর পেলেই যেন আমাকে কেটে পাঠিয়ে দেয়।

খুন রাহাজানি অ্যাক্সিডোন্ট অগ্নিকাণ্ড আত্মহত্যা-কিছুই বাদ নেই দেখছি।

তা নেই, বললেন মিঃ মজুমদার।

কিন্তু আপনি কী একটা ক্রাইমের কথা বলেছিলেন, যেটার কোনও কিনারা হয়নি?

হ্যাঁ-তেমন একটা ক্রাইম আছে বটে। সেটার খবর আপনি খাতায় পাবেন; আরেকটি আছে যেটা খাতায় পাওয়া যাবে না, কারণ সেটা খবরের কাগজের কানে পৌঁছায়নি।

সেটা কী ব্যাপার?

সেটা আমায় জিজ্ঞেস করবেন না, কারণ তার উত্তর আমি দিতে পারব না। আমায় মাপ করবেন। যাই হাক, রজত—একবার যাও তো সিক্সটি নাইনের ভালুমটা নিয়ে এসো।

রুজতবাবু এবার আর একটা খাতা নিয়ে এসে ফেলুদাকে দিলেন।

খাতার মাঝামাঝি পাবেন খবরটা, বললেন মিঃ মজুমদার।জুন মাসে ঘটে ঘটনাটা। স্টেটসম্যানের খবর, হেডিং হচ্ছে, যত দূর মনে পড়ে—এমবেজুলার আনট্রেসড।

পেয়েছি বলল ফেলুদা। তার পর কিছুটা পড়েই বলল, এ যে দেখছি আপনাদেরই ব্যাঙ্কের ঘটনা!

সেই জন্যেই তো। ওটা ভুলতে পারি না, বললেনঃ মিঃ মজুমদার।পড়লেই বুঝতে পারবেন, আমাদেরই ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের একটি ছেলে, নাম ভি. বাল্যাপোরিয়া, প্রায় দেড় লাখ টাকা ব্যাঙ্ক থেকে হাতিয়ে উধাও হয়ে যায়। পুলিশ বিস্তর চেষ্টা করেও তার আর সন্ধান পায়নি। আমি তখন ছিলাম ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার।

ফেলুদা বলল, যদিও অনেক'দিনের ঘটনা, তাও আমার ব্যাপারটা আবছা আবছা মনে আছে। গোয়েন্দা হবার আগে এই ধরনের ক্রাইমের খবর আমিও খুঁটিয়ে পড়তাম!

ইতিমধ্যে লালমোহনবাবু আর আমিও খবরটা পড়ে ফেলেছি।

বিরূপাক্ষবাবু বললেন, তখনই আমার একবার মনে হয়েছিল যে, শার্লক হামস বা এরক্যুল পোয়ারোর মতো একজন প্রাইভেট গোয়েন্দা থাকলে হয়তো ব্যাপারটার একটা সুরাহা হত। পুলিশের উপর আমার নিজের যে খুব একটা আস্থা আছে, তা নয়।

ফেলুদা কিছুক্ষণ খাতাটা উলটে পালটে দেখে। ধন্যবাদ দিয়ে ফেরত দিয়ে দিল।

ইতিমধ্যে কফি এসে গেছে। বেয়ারাটির বেশ ভদ্র চেহারা, হঠাৎ দেখলে চাকর বলে মনে হয় না। আমরা ট্রে থেকে কফি তুলে নিলাম।

ফেলুদা বলল, বাইরে আপনার ঘোড়াটা দেখলাম; আপনি বুঝি ওটাতেই চলা-ফেরা করেন?

মিঃ মজুমদার বললেন, চলা-ফেরা মানে আমি শুধু বিকেলে একবার বেরোই। বাকি সময়টা আমি বাড়িতেই থাকি। আমার অভ্যাসগুলো ঠিক সাধারণ মানুষের মতো নয়। রিটায়ার করার পর থেকে আমার রুটিনটা একটা অদ্ভুত চেহারা নিয়েছে। আমার ইনসমনিয়া আছে, সে কথা আগেই বলেছি। আমি ঘুমেই দুপুরবেলা, তাও এক গেলাস দুধের সঙ্গে একটা করে বড়ি খেয়ে; ঘড়িতে অ্যালাম দিয়ে শুই উঠি ঠিক পাঁচটায়। তারপর চা খেয়ে বেরেই। রাত্তিরটা আমি বই পড়ি।

একদমই ঘুমোন না রাত্রে? ফেলুদা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

একদমই না, বুললেন ভদ্রলোক।অবিশ্যি, এককালে আমার ঠাকুরদাদারও শুনেছি। এই বাতিল ছিল। তিনি ছিলেন ডাকসাইটে জমিদার। তাঁর রাতটা ছিল দিন, আর এদিনটা রাত। জমিদারির কাজকর্ম তিনি রাত্রেই দেখতেন, আর সারা দুপুর আফিং খেয়ে ঘুমোতেন। ভাল কথা, আপনার ধূমপানের প্রয়োজন হলে আমার সামনেই করতে পারেন; আই ডোন্ট মাইন্ড।

থ্যাঙ্ক ইউ, বলে ফেলুদা একটা চারমিনার ধরাল। বিরূপাক্ষবাবুর ষাটের কাছে বয়স হলেও তাঁকে বৃদ্ধ বলে মোটেই মনে হয় না।

কাল থেকে তো আপনার বাড়িতে শুটিং শুরু হবে, বলল ফেলুদা? আপনার উপর দিয়ে অনেক ধকল যাবে।

আই ডোন্ট মাইন্ড), বললেন ভদ্রলোক। আমি থাকব বাড়ির উত্তর প্রান্তে, কাজ হবে। দক্ষিণ দিকটায়। পরিচালক ভদ্রলোকটিকে বেশ ভাল লাগল, তাই আর না করলাম না।

এই কথা বলতে বুলতেই একটা জিপের আওয়াজ পেয়ে ঘুরে দেখি ফিল্মের দল এসে গেছে। বাগান পেরিয়ে দরজার মুখে এসে টাকা মারলেন পুলক ঘোষাল।

কাম ইন স্যার, বলে উঠলেন বিরূপক্ষ মজুমদার।

পুলক ঘোষাল ঢুকে এলেন, তাঁর পিছনে মহাদেব ভার্মা আর রাজেন রায়না।

আমরা শুটিং- এ বেরোচ্ছি, বলল পুলক ঘোষাল, তাই ভাবলাম একবার আপনার সঙ্গে দেখা করে যাই। কাল থেকে তো আপনার এখানেই কাজ, তা ছাড়া এই দুটি অভিনেতার সঙ্গে আপনার আলাপও হয়নি। ইনি হলেন ছবির নায়ক রাজেন রায়না, আর ইনি হলেন ভিলেন মহাদেব ভার্মা।

বসুন, বসুন, বললেন মিঃ মজুমদার। যখন এলেন, তখন একটু কফি খেয়ে যান।

না স্যার; আজ আর বসব না। কাল থেকে তো প্রায় সারাটা দিনই এখানে থাকতে হবে। ভাল কথা, আপনার সেক্রেটারি বলছিলেন। আপনি নাকি দুপুরটা ঘুমোন। তা, দুপুরে তো আমাদের কাজ হবে, এ বাড়ি থেকে একটু দূরে আমাদের জেনারেটর চলবে। তাতে আপনার ব্যাঘাত হবে না তো?

মোটেই না, বললেন মিঃ মজুমদার। আমি দরজা-জানলা ভেজিয়ে পরদা টেনে শুই। বাইরের কোনও আওয়াজ ঘরে ঢোকেই না।

লক্ষ করছিলাম ভদ্রলোক কথা বলার সময় রায়না। আর ভার্মার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখছেন। বললেন, যাক, এবার তা হলে বলতে পারব যে, ফিল্মস্টারের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। অ্যাদ্দিন এ সৌভাগ্যটা হয়নি।

এবার পুলক ঘোষাল লালমোহনবাবুর দিকে ফিরলেন।

লালুদা, আপনাকে একটা রিকোয়েস্ট ছিল।

কী ভাই?

আমার মেমরি খুব শাপ, লালুদা। আমার স্পষ্ট মনে আছে, নাইনটিন সেভেনটিতে গড়পারে ফ্রেন্ডস ক্লাবে ভূশণ্ডীর মাঠে প্লে হয়েছিল। সরস্বতী পুজোয়। আপনার মনে পড়ছে?

বিলক্ষণ!

আপনি তাতে নদু মল্লিকের পার্ট করেছিলেন, মনে আছে?

বাবা, সে কি ভুলতে পারি! পাখোয়াজের বোলটা পর্যন্ত এখনও মনে আছে–ধা ধা ধিন্‌তা কত্তা গে, গিন্নী ঘা দেন কর্তাকে!–ওঃ! সে কি ভোলা যায়? জীবনে আমার প্রথম এবং শেষ অভিনয়।

না না, শেষ নয়।

মানে?

এখানকার বেঙ্গলি ক্লাব আমাদের ডুবিয়েছে। বলেছিল দু-একটা ছাট পার্টের জন্য লোক দেবে, এখন বলছে তারা কলকাতায় চলে গেছে ছুটিতে। বিশেষ করে একটি পার্ট–বুঝেছেন। লালুদা, ভিলেনের রাইট হ্যান্ড ম্যান–

কে–অঘোরাচাঁদ বাটালিওয়ালা?

হ্যাঁ দাদা!

কিন্তু তার তো বেশি কিছু করার নেই; শুধু দুটো সিন।

সেই দুটো সিন আমাদের একটু উদ্ধার করে দিতে হবে দাদা! কথা খুব কম। আজ বিকেলে গিয়ে আপনাকে ডায়ালগ দিয়ে আসবে। এ কাজটা কাইন্ডলি আপনি করে দিন। সবসুদ্ধ তিন দিনের কাজ।

আমরা কিন্তু আর দশ দিন মাত্র আছি।

এক উইকের মধ্যে আপনার কাজ শেষ করে দেব।

কিন্তু এই চেহারা নিয়ে–

আপনাকে মেক-আপ দেব। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি আর একটা পরচুলা। ফাস্টক্লাস মানাবে। কেয়া ভাই মহাদেব, মেরা চয়েস মে কুছ গলতি হ্যায়?

নেহি নেহি ভাই, বললেন মহাদেব ভার্মা।

আপনার সিগার খাওয়ার অভ্যোস আছে? লালমোহনবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন পুলক ঘোষাল।

ধূমপান করতুম এককালে, হাত কচলাতে কচলাতে বললেন লালমোহনবাবু, কিন্তু সিগারেট ছেড়েছি দশ বছর হল।

তাতে কী হল? আর হ্যাঁ, চোখে একটা কালো চশমা।

বেশ বুঝতে পারছিলাম যে, লালমোহনবাবু ব্যাপারটাতে ক্রমেই মেতে উঠছিলেন। এবার বললেন, ওককে! যখন এত করে বলছি, তখন না করব না। আমার নিজের গল্পে একটা গেস্ট অ্যাপিয়ারেন্স থাকলে মন্দ কী? কিন্তু একটা কথা।

কী?

আমার নামের পাশে যেন একটা অ্যাঃ থাকে। পেশাদারি অভিনেতা হতে আমি নারাজ। হলে অ্যামেচার, আর না হলে নয়। ঠিক তো?

ওককে! বললেন পুলক ঘোষাল।

এই সুযোগে আমিও একটা ব্যাপার সেরে নিলাম। পুলক ঘোষালকে জিজ্ঞেস করলাম, আমি শুটিং দেখতে আসতে পারি তো?

একশোবার, ভাই, একশোবার, বললেন পুলক ঘোষাল।

৪. পুলক ঘোষালের দল

পুলক ঘোষালের দল তাদের কথা সেরে শুটিং-এর তোড়জোড় করতে চলে গেল। আমাদের কফি খাওয়া শেষ, তাই আমরাও আর বসলাম না। ফেলুদাই প্রথমে উঠে পড়ে বলল, আজি তা হলে আসি?

অ্যাঁ?

ভদ্রলোক যেভাবে প্রশ্নটা করলেন তাতে বুঝতেই পারলাম, তিনি কোনও একটা কারণে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। পরমুহূর্তেই অবিশ্যি নিজেকে সামলে নিয়ে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই বললেন, উঠবেন? ঠিক আছে। রয়েছেন যখন ক'দিন, তখন দেখা হবে নিশ্চয়ই।

আমরা তিনজনে নয়নপুর ভিলা থেকে বেরিয়ে উতরাই দিয়ে হোটেলমুখে রওনা দিলাম!

ফেলুদা পথে কিছুই বলল না। কেন জানি, ও-ও একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। দুপুরে লাঞ্চ খাবার সময় লালমোহনবাবুর দিকে ফিরে বলল, কী মশাই, আমাদের অ্যাদ্দিনের আলাপ, আর এমন একটা খবর আপনি বেমালুম চেপে গেসলেন? ভূশণ্ডীর মাঠেতে নদু মল্লিক? বাংলা সাহিত্যে এমন একটি চরিত্র খুঁজে পাওয়া ভার, আর আপনি সেই চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন?

লালমোহনবাবু একটা ফিশ ফ্রাইয়ের টুকরো মুখে পুরে দিয়ে বললেন, আরে মশাই, সে-রকম বলতে গেলে তো অনেক কিছুই বলতে হয়। নর্থ ক্যালকাটায় ক্যারাম চ্যাম্পিয়ন ছিলুম। ফিফটি নাইনে—এ খবর জানতেন? এনডিওরেন্স সাইক্লিং-এ আমার কত কীর্তি আছে, সে সব আপনি জানেন? আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় মেডেল পেয়েছি—একবার নয়, থ্রি টাইমস্! দেবতার গ্রাস পুরো মুখস্থ ছিল। ফিল্মে অফার বিশ বছর আগেও পেয়েছি—তখন আমার মাথা ভর্তি কোঁকড়া চুল-ভাবতে পারেন? কিন্তু সে অফার নিইনি। তখন থেকেই

মাইন্ড মেক আপ করেছি যে লেখক হব। শখের লেখক নয়, পেশাদারি লেখক। স্রেফ লিখে পয়সা করা যায়। কিনা দেখব। তার পরের ইতিহাস অবিশ্যি খুব সহজ। খগেন জ্যোতিষী বলেছিল–তোমার কলমে জাদু আছে, তুমি লেখো। তবে এতটা যে সাকসেস হবে, তা অবিশ্যি ভাবতে পারিনি।

একটা কথা কিন্তু বলে রাখছি, বলল ফেলুদা।

কী?

এরা আপনাকে দিয়ে চুরুট খাওয়াবে। আপনি দশ বছর হল স্মোকিং ছেড়েছেন। সুতরাং একটা বিপর‍্যায়র সম্ভাবনা আছে।

বলছেন?

বলছি। এক কাজ করবেন। আজই একটা চুরুট কিনে ধোঁয়াটা পেটে না নিয়ে খাওয়া অভ্যাস করুন। পেটে গেলেই কিন্তু কাশির দমকের চোটে শট একেবারে মাটিংচকার হয়ে যাবে।

থ্যাঙ্ক ইউ ফর দি অ্যাডভাইস, স্যার।

দুপুরে একটু বিশ্রাম করে চারটে নাগাত আমরা বেরিয়ে পড়লাম। আজ অবজারভেটরি হিলটায় একটা চক্কর মারার ইচ্ছে আছে। পাহাড়ের উত্তর দিক থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার একটা চমৎকার ভিউ পাওয়া যায়।

লালমোহনবাবু প্রথম যে সিগারেটের দোকানটা পেলেন, সেখান থেকেই একটা চুরুট কিনে নিলেন। প্রথম টানে ধোঁয়া পেটে চলে গিয়ে সত্যিই একটা বিপর্যয় হতে যাচ্ছিল, কিন্তু ভদ্রলোক সেটা কোনও মতে সামলে নিয়ে তারপর থেকে খুব সাবধানে ধোঁয়া টানামাত্র সেটা ছেড়ে দিতে লাগলেন। চুরুট হাতে নেবার সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোকের পার্সোর্ণনালটির একটা বদল লক্ষ করছিলাম। বেশ একটা মিলিটারি মেজাজ, জুতোর

গোড়ালি দিয়ে শব্দ তুলে হাঁটা, ঠোঁটের কোণে একটা মৃদু হাসি নিয়ে এদিক-ওদিক চাওয়া। বুঝলাম, ভদ্রলোক অঘোরাচাঁদ বাটলিওয়ালার চরিত্রে অভিনয় করতে করতে চলেছেন।

অবজারভেটটি হিলের পুবের রাস্তাটা দিয়ে গিয়ে যেই বাঁয়ে মোড় নিয়েছি, অমনি সামনে দেখি বিকেলের পড়ন্ত রোদে কাঞ্চনজঙ্ঘায় সোনার রং ধরতে শুরু করেছে। লালমোহনবাবুর আবার কাব্যের মেজাজ এসে পড়ল, অয়ি কাঞ্চনজঙঘে বলে আর বাকি কবিতাটা বললেন না। আমরা পুরো পাহাড়টা চক্কর দিয়ে আবার যখন ম্যালে ফিরে এলাম তখন পাঁচটা বেজে গেছে, সূর্য পাহাড়ের পিছনে চলে গেছে। পুবে জালাপাহাড় রোডের দিকে চেয়ে দেখি ঘোড়ার স্ট্যান্ডের সামনে দিয়ে শুটিং-এর দল মালপত্তর কাঁধে নিয়ে ফিরছে, তার পিছনে লোকের ভিড়। তবে এ ভিড় মোটামুটি ভদ্র, বেশি উৎপাত করবে বলে মনে হল না। রায়না। আর ভার্মা দুজনকেই কিছু অটাগ্রাফে সই দিতে হল সেটা দেখলাম। তার পর দলটা বাঁয়ে নেহরু রোড ধরে বোধহয় সোজা হোটেলের দিকে চলে গেল।

গুড ইভনিং!

ঘোড়ার পিঠে বিরূপাক্ষ মজুমদার। আমাদের দেখে নেমে এলেন।

একটা কথা আজ সকলে আপনাকে বলা হয়নি, মিঃ মজুমদার ফেলুদাকে উদ্দেশ করে গলা নামিয়ে কথাটা বললেন। তারপর আরও কাছে এগিয়ে এসে বললেন, এ খবরটা আমার মালীর কাছ থেকে শোনা; কত দূর রিলায়েবল তা বলতে পারব না।

কী খবর? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

ক দিন থেকেই নাকি একটি লোককে আমাদের গেটের বাইরে বাড়ির আশেপাশে ঘোরাফেরা করতে দেখা যাচ্ছে।

বলেন কী।

মালীও তাই বলে। লোকটা পুরনো, তার কথা অবিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই।

লোকটার কোনও বর্ণনা দিয়েছে?

বলছে মাঝারি হাইট, রং মাঝারি, খোঁচা খোঁচা দাড়ি আছে। মুখ ভাল করে দেখেনি, কারণ চোখে চোখ পড়তেই লোকটা গাছের আড়ালে চলে যায়। তবে সিগারেট বা বিড়ি খায় এটা মালী বলল, কারণ গাছের পিছন থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখেছে।

এইভাবে দৃষ্টি রাখার কোনও কারণ খুঁজে বার করতে পারেন আপনি?

তা পারি। আমার বাড়িতে একটা মূল্যবান জিনিস আছে। অষ্টধাতুর তৈরি একটা বালগোপাল। আমাদের পৈতৃক বাড়ির মন্দিরের মধ্যে ছিল এটা। নয়নপুরে। জিনিসটা খুবই ভ্যালুয়েবল? আর সেটা এখানে অনেকেই দেখেছে।

সেটা কোথায় থাকে?

আমার শোবার ঘরে তাকের উপর।

খোলা অবস্থায়?

আমি তো রাত্রে জেগে থাকি, আর আমার সঙ্গে রিভলভার থাকে, কাজেই চোর বিশেষ কিছু করতে পারবে না।

আর কোনও কারণে লোক হানা দিতে পারে?

আমি এটুকু বলতে পারি যে আমার অনিষ্ট করতে চাইবে এমন লোক থাকা অসম্ভব নয়। এটা কেন বলছি তার কারণ জিজ্ঞেস করবেন না। আমি শুধু এইটুকু জানতে চাই যে এর মধ্যে যদি কিছু ঘটে তা হলে আপনার সাহায্য আশা করতে পারি তো?

দ্যাট গোজ উইদাউট সেইং, বলল ফেলুদা।

তা হলেই নিশ্চিন্ত, বললেন ভদ্রলোক।

এমন সময় একটি বছর ত্রিশের ভদ্রলোক আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন।এসো সমীরণ, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই বললেন মিঃ মজুমদার।ইনি হচ্ছেন আমার একমাত্র পুত্র সমীরণ, আর ইনি প্রদোষ মিত্র, আর ইনি লালচাঁদ–স্যারি, লালমোহন…গাঙ্গুলী তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আর ইনি প্রদোষবাবুর কাজিন।

সমীরণ মজুমদার বেশ স্মার্ট দেখতে, তার উপর একটা গাঢ় লাল জার্কিন পরাতে আরও স্মার্ট দেখাচ্ছে। বললেন, আপনি তো বিখ্যাত ডিটেকটিভ?

বিখ্যাত কিনা জানি না, বলল ফেলুদা, তবে ডিটেকশন আমার পেশা বটে।

আমি আবার খুব গোয়েন্দা কাহিনীর ভক্ত। আপনার সঙ্গে এক'দিন বসে কথা বলার ইচ্ছা! বইল।

আজ একটু শপিং-এ বেরিয়েছি। এক্সকিউজ মি।

সমীরণবাবু চলে গেলেন।

আমিও আসি। ঘোড়ার পিঠে চড়ে বললেন মিঃ মজুমদার।আবার দেখা হবে নিশ্চয়ই।

প্রয়োজনে টেলিফোন করতে দ্বিধা করবেন না, বলল ফেলুদা। আমরা উঠেছি কাঞ্চনজঙ্ঘা হোটেলে।

ইতিমধ্যে একটি অচেনা ছেলে এসে লালমোহনবাবুর হাতে একটা কাগজ ধরিয়ে দিয়ে গেছে। সেটা নাকি ওঁর আগামীকালের ডায়ালগ। হিন্দি ডায়ালগ বাংলা অক্ষরে লিখে দিয়েছে, সুবিধাই হল।

অনেক কথা আছে? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

সাড়ে তিন লাইন, শুকনো গলায় বললেন লালমোহনবাবু।

হোটেলে ফিরে গিয়ে একবার দেবেন তো আমাকে ডায়ালগটা, বলল ফেলুদা। আপনাকে একটু তালিম দিয়ে দেব। আপনার হিন্দিতে বড় বেশি শ্যামবাজারের টান এসে পড়ে।

আমরা গতকালের মতো আজকেও ফেরার আগে একবার কেড়েনটারসের ছাতে গিয়ে বসলাম হট চকোলেট খাবার জন্য। ঠাণ্ডা বেশ কনকনে, তার উপর মেঘ নেই বলে শীত আরও বেশি। এর মধ্যেই অনেক তারা বেরিয়ে পড়েছে আকাশে, আর তার সঙ্গে আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে ছায়াপথটা।

এখানে বসতে পারি?

আমরা তিনজন একটা টেবিলে বসেছিলাম। আমাদের পাশে একটা চেয়ার খালি ছিল; এবার দেখলাম। একজন বছর ষাটেকের বাঙালি ভদ্রলোক সেটার পিছনে এসে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে হাসি-হাসি মুখ করে চেয়ে আছেন। চোখে চশমা, কাঁচা-পাকা মেশানো গোঁফ আর মাথার চুল।

বসুন, বলল ফেলুদা।

আপনার পরিচয় আমার জানা আছে, ভদ্রলোক ফেলুদার দিকে চেয়ে বললেন, আপনার একটা ছবি সমেত সাক্ষাৎকার বোধহয় একটা বাংলা পত্রিকায় বেরিয়েছিল। বছর খানেক আগে।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কিন্তু এঁকে তো–?

ইনি ঔপন্যাসিক লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

কিছু মনে করবেন না-এভাবে উড়ে এসে জুড়ে বসলাম-কিন্তু আজ। আপনাদের দেখলাম আমার পাশের বাড়িতে ঢুকতে। আমি নয়নপুর ভিলার উত্তরের বাড়িটায় থাকি।

বাড়িটার নাম দ্য রিট্রিট, আর আমার নাম হরিনারায়ণ মুখার্জি।

নমস্কার।

নমস্কার–ইয়ে, আপনি কি কোনও তদন্তের ব্যাপারে এখানে এসেছেন?

আজ্ঞে না। এসেছি ছুটি কাটাতে।

না, মানে, বিরূপাক্ষ মজুমদারের বাড়িতে একজন গোয়েন্দা ঢুকছে দেখলে মনে হয়...

কেন? উনি কি কোনও গোলমালে জড়িয়ে আছেন নাকি?

ইয়ে, ওঁর সম্বন্ধে পাঁচ রকম গুজব শোনা যায় তো!

ওঃ, তাই বলুন! না, উনি কোনও গোলমালে জড়িয়ে আছেন বলে মনে হল না। আর গুজবে কান দেওয়াটা আমি বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি না।

তা তো বটেই। তা তো বটেই।

আমার মনে হল, ফেলুদা ইচ্ছে করেই মিঃ মজুমদারের লেটেস্ট ব্যাপারটা চেপে গেল। ইনি কোথাকার কে তা কে বলতে পারে? আর ভদ্রলোক সত্যিই তো উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন।

কেভেনিটারসের ছাতে আলো অল্পই, কিন্তু তার মধ্যেই দেখছিলাম। লালমোহনবাবু পকেট থেকে তাঁর কাগজটা বার করে ডায়লগট আউড়ে দেখছেন।

তা হলে উঠি? আলাপ করে খুব ভাল লাগল।

হরিনারায়ণ মুখার্জি চলে গেলেন।

মনে হল ভদ্রলোক এখানকার অনেক দিনের বাসিন্দা, ফেলুদা মন্তব্য করল।

সেটা আবার কী করে বুঝলেন মশাই?

আমাদের চেয়ে শীতটা বেশি সহ্য করতে পারেন। সুতির শার্টের উপর একটা গরম চাদর জড়িয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। পায়ে মোজাও পারেননি। ভদ্রলোককে একটু কালটিভেট করতে পারলে মন্দি হত না?

কেন?

আজ জানান দিয়ে গেলেন যে ওঁর কাছে খবর আছে।

কেন জানি না, হট চকোলেটটা খেতে খেতে মনে হচ্ছিল যে ঘটনা যেভাবে এগোচ্ছে, যে-সব লোকের সঙ্গে আলাপ করে যে-সব খবর জানতে পারছি, তার থেকে একটা বিস্ফোরণ ঘটা খুব আশ্চর্য নয়; কিন্তু সেটা যে এত তাড়াতাড়ি ঘটবে সেটা ভাবতেই পারিনি।

৫. পরদিন ব্রেকফাস্ট শেষ করতে না করতে

পরদিন ব্রেকফাস্ট শেষ করতে না করতে পুলক ঘোষালের কাছ থেকে গাড়ি নিয়ে লোক এসে গেল লালমোহনবাবুর জন্য। আগের দিন রাত্রে ফেলুদার কাছ থেকে তালিম নিয়ে লালমোহনববাবু তাঁর সাড়ে তিন লাইন ডায়লগটা তৈরি করে নিয়েছিলেন। যে লোকটি তাঁকে নিতে এল সে বাঙালি, নাম নীতিশ সোম। সে বলল আজ প্রথম দিন, তাই শুটিং আরম্ভ হতে হতে বারোটা হবে। কিন্তু লালমোহনবাবুর মেক-আপ আছে। তাই তাঁকে আগে প্রয়োজন। জামাকাপড়ের কথা পুলকবাবু আগেই বলে দিয়েছিলেন ফোন করে; লালমোহনবাবু নিজের কোট-প্যান্টই পরবেন, তবে কী রঙের সেটা এখনও ঠিক হয়নি, তাই তিনি সঙ্গে যা এনেছেন সবই নিয়ে যেতে হবে। আমিও যেতে চাই শুনে নীতিশবাবু বললেন, আপনি বরং এগারোটা নাগাত আসবেন। ততক্ষণে আমাদের তোড়জোড় প্রায় শেষ হয়ে যাবে। তা ছাড়া আজ তো মহরত, তাই একটা ছোট অনুষ্ঠান আছে। সেটা এগারোটায় এলে দেখতে পাবেন। আপনি দুপুরের লাঞ্চটাও না হয় আমাদের সঙ্গেই করবেন; হোটেল থেকে প্যাক্ড লাঞ্চ আসবে।

সাড়ে আটটার মধ্যেই একটা সুটকেস নিয়ে দুগ্রগ বলে। লালমোহনবাবু বেরিয়ে পড়লেন।

আমি আর ফেলুদা নটা নাগাত হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লাম। আজ আমরা একটু জালাপাহাড় রোড দিয়ে হাঁটব। ফেলুদা বলল, দার্জিলিং-এ এসে সকালটা হোটেলে বসে থাকার কোনও মানে হয় না।

আজকের দিনটাও রোদ-ঝলমল, উত্তরে কাঞ্চনজঙ্ঘা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। ম্যালের বেঞ্চিতে লোক ভর্তি, কারণ পুজোয় অনেক চেঞ্জীর এসেছে। আমরা ঘোড়ার স্ট্যান্ড ছাড়িয়ে জালাপাহাড় রোড দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। ফেলুদা সিগারেট খাওয়া অনেক কমিয়ে দিলেও ব্রেকফাস্টের পর একটা না খেয়ে পারে না। একটা চারমিনার ধরিয়ে দৃশ্য দেখতে দেখতেই আমাকে প্রশ্ন করল, হালচাল কীরকম বুঝছিস?

আমি বললাম, এখন পর্যন্ত বিরূপাক্ষ মজুমদারকেই সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং লোক বলে মনে হচ্ছে।

সেটা ঠিক। অবিশ্যি তার একটা কারণ হচ্ছে যে, একমাত্র এই ভদ্রলোক সম্বন্ধেই আমরা বেশ কিছু তথ্য জেনেছি, আর সেগুলো খুবই ইন্টারেস্টিং; যে লোক দিনে ঘুমোয় আর রাতে জাগে, যে লোক গরম গরম খবর কাগজ থেকে কেটে খাতায় সেঁটে রাখে, যে বলে যে তার জীবনে একটা রহস্য আছে কিন্তু সেটা সে প্রকাশ করতে চায় না, আর যে একটা মহামূল্য জিনিস সিন্দুকে না রেখে তার ঘরের তাকে রাখে, তাকে কোনও মতেই স্বাভাবিক মানুষের পর্যায়ে ফেলা চলে না।

ওঁর ছেলে তো প্রায় কথাই বললেন না।

হ্যাঁ। আমার কাছে ভদ্রলোককে বেশি রহস্যজনক বলে মনে হল; ভাবটা যেন বেশি। কথা বললে কোনও রহস্য প্রকাশ পেয়ে যাবে, তাই সামলে চলছে।

আর রজতবাবু?

তোর কী মনে হল?

মনে হল যে লোকটার চোখ খারাপ কিন্তু চশমা নেয়নি। একটা মোড়ায় ধাক্কা খেলেন। দেখলে না?

একসেলেন্ট! একদম ঠিক বলেছিস; চশমাটা হয়তো ভেঙেছে; আর মাইনাস পাওয়ার তাতে সন্দেহ নেই।–অর্থাৎ দূরের জিনিস দেখতে পায় না, কাছের জিনিস পায়–ত না হলে ঠিক ঠিক খাতাগুলো আনতে পারত না।

আর বম্বের হিরো আর ভিলেন?

তোর কী মনে হয়? আজকে তোর পরীক্ষাই হোক।

কাল একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ করলাম।

কী?

লালমোহনবাবু যখন নদু মল্লিকের পাখোয়াজের বালটা বলছিলেন, তখন রায়না। আর ভার্মা দুজনের ঠোঁটের কোণেই হাসি দেখা দিল।

এটাও দুর্দান্ত বলেছিস।

তার মানে কি ওরা বাংলা জানে?

আসলে বম্বের ফিল্ম-জগতে এত বাঙালি কাজ করে যে, বাংলাটা অল্পবিস্তর অনেকেই বুঝতে পারে, বলতে না পারলেও।

ওদের দুজনকে দেখে মিঃ মজুমদার একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন, সেটা লক্ষ করেছিলো নিশ্চয়ই।

তা তো বটেই।

অবিশ্যি মিঃ মজুমদারের মনটা যেন মাঝে মাঝেই অন্য দিকে চলে যায়, তাই না?

হ্যাঁ, লোকটা সব সময় যেন কিছু একটা ভাবছে। সেটা হয়তো বোঝা যাবে ওঁর সম্বন্ধে গুজবটা কী সেটা জানলে।

আমরা প্রায় দেড় ঘণ্টা ঘোরার পর হোটেলে ফিরলাম। ফেলুদা বলল, তুই আজ মনের আনন্দে শুটিং দেখিস; আমার কথা চিন্তা করিস না। আমি ভাবছি, একবার অবজারভেটরি হিলের মাথায় গুম্ফাটা দেখে আসব।

আমি ঠিক সময়ে সাড়ে এগারোটায় বেরিয়ে কুড়ি-পঁচিশ মিনিটে নয়নপুর ভিলায় পৌঁছে গেলাম। ফন্ট ফন্ট শব্দ শুনে বুঝলাম যে জেনারেটর চালু হয়ে গেছে। কিন্তু সেটা যে

কোথায় রাখা হয়েছে, তা বুঝতে পারলাম না। আমাকে দেখে ওদের দলের একজন এগিয়ে এসে ভিতরে ডেকে নিয়ে গেল। এ দিকটা বাড়ির দক্ষিণ দিক, এ দিকে কাল আসিনি। একটা ঘরের মধ্যে কাজ হচ্ছে, সেখানে জোরালো স্টুডিয়ার আলো জ্বলছে। জানালা বন্ধ করে বাইরে থেকে দিনের আলো আসার পথ বন্ধ করে দিয়েছে। বুঝলাম দৃশ্যটা বোধহয় রাত্রের দৃশ্য, যদিও তোলা হচ্ছে দিনের বেলা।

কিন্তু আমাদের জটায়ু কোথায়?

ও মা-ওই তো ভদ্রলোক! কিন্তু প্রথম দেখে একেবারেই চিনতে পারিনি।-দাড়ি আর পরচুলায় চেহারা এত বদলে গেছে। দিব্যি ভিলেন-ভিলেন লাগছে ভদ্রলোককে। আমায় দেখতে পেয়ে চেয়ার থেকে উঠে এগিয়ে এসে বেশ ভারিক্কি চালে জিজ্ঞেস করলেন, কী মনে হচ্ছে? চলবে?

আমি ভদ্রলোকের চেহারার তারিফ করে বললাম, আপনার কথাগুলো মনে আছে তো?

আলবৎ! উীষণ কনফিডেন্সের সঙ্গে বললেন ভদ্রলোক।

অন্য একটা সোফায় বসে মহাদেব ভার্মা তাঁর গোঁফে চাড়া দিচ্ছিলেন। এবার পুলক ঘোষালের গলা পেলাম।

লালুদা।

লালমোহনবাবু তাড়াতাড়ি গিয়ে তাঁর চেয়ারে বসলেন। আমি একটা সুবিধের জায়গা বেছে নিয়ে সেখান থেকে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম।

পুলক ঘোষাল এবার লালমোহনবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে হাত-পা নেড়ে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন।

লালুদা, আপনি প্রথমে বুক পকেট থেকে একটা চুরুট বার করে মুখে পুরবেন; সেই সঙ্গে মহাদেবও একটা সিগারেট মুখে পুরবে। তারপর আপনি পকেট থেকে, দেশলাই বার করে মহাদেবের সিগারেটটা ধরিয়ে দেবেন, তারপর নিজের চুরুটটা ধরাবেন। তার পরে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসবেন। তখন আমি ইয়েস বলাব। তাতে আপনি চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে আপনার প্রথম কথাটা বলবেন। এর পরেই শটু শেষ। এই শর্টুটা কিন্তু প্রধানত আপনারই শটি! ক্যামেরা আপনারই মুখ দেখছে, আর মহাদেবের দেখছে পিঠ। বুঝেছেন?

ইয়েস, বললেন লালমোহনবাবু। তবে একটা কথা।

বলুন।

এ দেশলাইট জ্বলবে তো?

হ্যাঁ হ্যাঁ। একেবারে টাট্‌কা। আজই সকলে কেনা।

ভেরি গুড।

মিনিটখানেক আরও আমড়াগাছির পর শট আরম্ভ হল। ক্যামেরা আর সাউন্ড চালু হল, আর পুলকবাবু বলে উঠলেন, অ্যাকশন!

লালমোহনবাবু মুখে চুরুট পুরলেন ঠিকই, কিন্তু দেশলাইটা ধরাতে গিয়ে বারুদের দিকটা হাতে ধরে উলটা দিকটা ঘষতে লাগলেন দেশলাইয়ের গায়ে। খচ্ খচ্ খচ্ খচ্–দেশলাই আর জ্বলে না, এ দিকে ক্যামেরা চলেছে ঘড়ঘড় শব্দ করে।

কাট, কাট। চেঁচিয়ে উঠলেন পুলক ঘোষাল। লালুদা, আপনার বোধহয়–

সরি ভাই, ভেরি সরি। এবার আর ভুল হবে না।

দ্বিতীয়বার অবিশ্যি চুরুট আর সিগারেট ঠিকই জ্বলল, কিন্তু চুরুটে টানটা একটু বেশি মাত্রায় হওয়ায় লালমোহনবাবুর বিষম লেগে শটুটা নষ্ট হয়ে গেল, আর পুলক ঘোষালকে আবার চেঁচিয়ে বলতে হল, কাট, কাট!

তিনবারের বার আর কোনও ভুল হল না। ও কে! বলে চেঁচিয়ে উঠলেন পুলক ঘোষাল, আর সকলে লালমোহনবাবুকে তারিফ করে হাততালি দিয়ে উঠল।

আশ্চর্য এই যে, আরও পাঁচ ঘণ্টা লালমোহনবাবুকে নিয়ে কাজ হল আর তার মধ্যে ভদ্রলোক একটাও ভুল করলেন না। এর মধ্যে অবিশ্যি ভদ্রলোককে দুবার বাথরুমে যেতে হয়েছিল; সেটা শীতের জন্যও হতে পারে আবার নার্ভাসনেসের জন্যও হতে পারে। মোট কথা, পুলক ঘোষাল স্যাটিসফাইড।

কাল আবার সেম টাইমে লো যাবে কিন্তু, বললেন পুলকবাবু।

লোক যাবার কোনও দরকার ছিল না ভাই, বললেন লালমোহনবাবু। আমি এমনিই চলে আসতে পারতাম।

না না, তা কি হয়? বললেন পুলকবাবু। আমরা সকলের জন্যই লোক পাঠাই। ওটা আমাদের একটা নিয়ম।

লালমোহনবাবুর মেক-আপ তুলতে লাগল দশ মিনিট, তারপর প্রোডাকশনের একটা জিপে করে আমরা আমাদের হোটেলে ফিরে এলাম।

নিজের ঘরে না গিয়ে আমাদের ডাবল রুমে এসে লালমোহনবাবু বিছানায় চিৎপটাং হয়ে শুয়ে পড়লেন। আমি ফেলুদাকে বলে দিলাম। লালমোহনবাবুর কাজ খুব ভাল হয়েছে আর সকলে খুব তারিফ করেছে।

বাঃ, তা হলে আর কী, বলল ফেলুদা, তা হলে তো বাজিমাৎ। একটা নতুন দিক খুলে গেল। এবার আর শুধু রহস্য-রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক নয়, চলচ্চিত্রাভিনেতাও বটে।

লালমোহনবাবু এতক্ষণ চোখ বুজে পড়ে ছিলেন, হঠাৎ চোখ খুলে উঠে বসে ফেলুদার দিকে চেয়ে বললেন, দেখছেন, আরেকটু হলে ভুলেই যাচ্ছিলাম। আপনাকে যে একটা অত্যন্ত জরুরি কথা বলার আছে।

কী ব্যাপার?

শুনুন মন দিয়ে। আজ দেড়টায় লাঞ্চ ব্রেক হয়েছে। আমি সেই ফাঁকে টুক করে একবার স্মল ওয়র্ক সা িরতে গিয়েছিলাম বাথরুমে। বাড়ির দক্ষিণে আমাদের কাজ হচ্ছে; সে দিকে বাথরুম আছে, কিন্তু তার ভেতর এরা শুটিং-এর যাবতীয় মালপত্তর রেখেছে; তাই আমাকে যেতে হল উত্তর দিকে—অর্থাৎ যে দিকে মিঃ মজুমদার থাকেন। প্রোডাকশনের একজন ছোকরাই আমাকে বাথরুমটা দেখিয়ে দিল। আমি গেলুম। এটা একটা আলাদা বাথরুম, বেডরুমের সঙ্গে অ্যাটাচড় নয়। আমি কাজ সেরে হাত ধুয়ে চাখে-মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে, বাইরে এসেই কাছের কোনও একটা ঘর থেকে শুনি মিঃ মজুমদারের গলা। ভদ্রলোক কাকে যেন কড়া গলায় শাসনের সুরে বলছেন, ইউ আর এ লায়ার; তোমার একটা কথাও আমি বিশ্বাস করি না। যদিও গলার স্বর চাপা, কিন্তু তাতে যে ঘোর বিরক্তি প্রকাশ পাচ্ছিল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

বাংলায় বললেন কথাটা?

ঠিক আমি যেমন বললাম। প্রথম অংশ ইংরিজি, বাকিটা বাংলা।

তার মানে ভদ্রলোক তখনও ঘুমোননি?

না; কারণ কাল যখন লাঞ্চ ব্রেক হয়, তখনও ভদ্রলোককে দক্ষিণের বারান্দায় দেখেছি। উনি শুটিং দেখতে এসেছিলেন। সকালে আমার সঙ্গে কথা হয়েছে। উনি দেড়টায় বড়িটা খান, তার পর ঘুমোন। আমি যখনকার কথা বলছি, তখন দেড়টা বেজে মিনিট সাতেক হয়ে গেছে।

ভদ্রলোকের কথার উত্তরে অন্য লোকটি কিছু বললেন না?

বলে থাকলেও সেটা এত চাপা গলায় যে, আমি শুনতে পাইনি। আমার আবার তখন তাড়া—লাঞ্চ রেডি—তাই আর অপেক্ষা না করে চলে এলাম। কিন্তু মিঃ মজুমদারই যে কথাটা বলেছেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

তার মানে হয় রজত বোস, না হয় নিজের ছেলে সমীরণ মজুমদারকে বলেছেন কথাটা। লালমোহনবাবু হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে বললেন, তবে একটা কথা কিন্তু বলতেই হবে মশাই। এই সব বোম্বাই-অভিনেতাদের বিষয়ে যত কিছু শোনা যায়, আসলে তত কিছু নয়।

এটা কেন বলছেন?

লাঞ্চের পর রায়নার সঙ্গে একটা শট ছিল, সেটা ছেকরার ভুলের জন্য পাঁচবার করে নিতে হল। সামান্য ডায়ালগ, তবু বার বার ভুল করছে।

ও রকম হয়েই থাকে, বলল ফেলুদা, সেরা অভিনেতারও হঠাৎ হঠাৎ নার্ভ ফেল করতে পারে।

সব শেষে জটায়ু বললেন, যেটুকু নার্ভাসনেস ছিল, আজ সম্পূর্ণ কেটে গেছে। আর কোনও ভাবনা নেই।

৬. বজ্রপাতটা হল পরের দিন

বজ্রপাতটা হল পরের দিন, তবে আসল ঘটনাটা সরাসরি না বলে আগে দিনটা কীভাবে গেল বলি।

দিনটা মেঘলা, তাই কাঞ্চনজঙ্ঘা রয়েছে আড়ালে। আমি ফেলুদার সঙ্গে সকলে বেরিয়ে একটু কেনাকাটা সেরে, বার্চ হিল রোড দিয়ে খানিকদূর বেড়িয়ে এগারোটা নাগাত রওনা দিলাম নয়নপুর ভিলায়। গতকাল রাত্রেও ফেলুদা লালমোহনবাবুকে তালিম দিয়েছে। এবারে সাড়ে তিনের জায়গায় সবসুদ্ধ পাঁচ লাইন ডায়ালগ। আজ আর চুরুট-সিগারেট ধরানোর ব্যাপার নেই, তাই সেদিক থেকে বাঁচোয়া।

লালমোহনবাবুর সাতটা শট ছিল। সাড়ে নটায় কাজ আরম্ভ হয়েছে। আড়াইটেয় লাঞ্চ ব্রেক হয়েছে। লাঞ্চের আগে চারটে, পরে তিনটে শট হয়ে সাড়ে চারটের সময় লালমোহনবাবু ফ্রি হয়ে গেলেন। পুলক ঘোষাল বলল, জিপের ব্যবস্থা আছে লালুদা, আপনি এনি টাইম যেতে চাইলে যেতে পারেন।

লালমোহনবাবু বললেন, আজি যখন তাড়াতাড়ি শেষ হল, তখন ভাবছি হেঁটেই বাড়ি ফিরব; গাড়ির দরকার নেই।

জাস্ট অ্যাজ ইউ লাইক, বলল পুলক ঘোষাল।

পুলক ঘোষাল চলে গেলে পর লালমোহনবাবু বললেন, এদের চা-টা বেশ ভাল; এক্ষুনি চা দেবে, সেটা খেয়ে বেরিয়ে পড়ব।

দেড় মাইলের উপর রাস্তা, তাই চা খেয়ে পাঁচটা নাগাত বেরিয়ে হোটেল পৌঁছতে পৌঁছতে সাড়ে পাঁচটা হয়ে গেল।

ঘরে ঢুকেই দেখি ফেলুদা গায়ে জ্যাকেট চাপাচ্ছে।

বেরোচ্ছ নাকি? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

ফেলুদা আমাদের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল, তোরা ছিলি না। ওখানে? তোরা শুনিসনি?

আমরা তো আধা ঘণ্টা হল বেরিয়েছি, তখন পর্যন্ত তো কিছু শুনিনি। কী ব্যাপার?

মিঃ মজুমদার খুন হয়েছেন।

অ্যাঁ।

আমরা দুজনেই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলাম।

ভদ্রলোক সাড়ে বারোটা নাগাত আমায় ফোন করেছিলেন। বললেন আমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে, সেটা সন্ধ্যায় আমার এখানে এসে বলবেন। আর তার পর এই ব্যাপার।

তুমি খবর পেলে কী করে?

ওঁর ছেলে ফোন করেছিলেন এই পাঁচ মিনিট আগে। পুলিশে খবর দিয়েছেন, কিন্তু আমাকেও যেতে বললেন। পাঁচটার পরেও ভদ্রলোকের ঘুম ভাঙছে না দেখে সমীরণবাবু ওঁর ঘরে ঢোকেন; বাবাকে কী যেন একটা বলার ছিল। দরজাটা কেবল ভেজানো ছিল; মিঃ মজুমদার ছিটকিনি লাগাতেন না। কখনও। ঢুকে দেখেন রক্তাক্ত কাণ্ড! বুকে ছোরা মেরেছে ঘুমন্ত অবস্থায়। ওঁর বাড়ির ডাক্তার এসে বলে গেছেন ছুরির আঘাতেই মৃত্যু হয়েছে। শুটিং অবশ্যই বন্ধ হয়ে গেছে, এবং স্বভাবতই কিছু দিন বন্ধ রাখতে হবে। কারণ পুলিশ তদন্ত করবে। যাই হাক-আমি তো চললাম! তোরা কি থাকিবি, না আমার সঙ্গে যাবি?

থাকব কী! বললেন লালমোহনবাবু। এর পরে কি আর থাকা যায়? চলুন বেরিয়ে পড়ি।

আমরা তিনজন যখন নয়নপুর ভিলা পীছলাম, তখন সোয়া ছটা। চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেছে, আকাশে মেঘ, টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। শুটিং-এর দলের সকলেই রয়েছে। পুলক ঘোষাল কাছেই ছিলেন, আমাদের দেখে এগিয়ে এসে বললেন, কী বিশ্রী ব্যাপার বলুন তো! ভারী মাই ডিয়ার লোক ছিলেন মিঃ মজুমদার। এক কথায় কাজ করার অনুমতি দিয়ে দিয়েছিলেন।

বাড়ির বাইরে পুলিশের জিপ দাঁড়িয়ে আছে সেটা আগেই লক্ষ করেছি।

আমরা বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম। সামনের বারান্দায় একজন ইনস্পেক্টর দাঁড়িয়ে আছেন। বছর চল্লিশেক বয়স, ফেলুদার দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, আপনার নাম অনেক শুনেছি। আমি ইনস্পেক্টর যতীশ সাহা।

করমর্দন শেষ হবার পর ফেলুদা বলল, কী ব্যাপার? কী বুঝলেন?

ঘুমের মধ্যেই খুনটা হয়েছে, যত দূর মনে হয়।

কী দিয়ে মেরেছে?

একটা ভুজালি। সেটা বুকেই ঢোকানো রয়েছে। ওটা নাকি মিঃ মজুমদারের ঘরেই থাকত।

আপনাদের ডাক্তার এসেছেন কি?

এই এলেন বলে। আসুন না ভিতরে।

মিঃ মজুমদারের শোবার ঘরটা বেশ বড়। আমি লালমোহনবাবু দরজার মুখেই দাঁড়িয়ে রইলাম, ফেলুদা ভিতরে গেল। মৃতদেহ সাদা চাদর দিয়ে ঢেকে ফেলা হয়েছে।

একটা কথা আপনাকে বলে দিই, ফেলুদাকে এক পাশে ডেকে নিয়ে বললেন যতীশ সাহা, আমরা তো যথারীতি আমাদের ইনভেসটিগেশন চালিয়ে যাব, তবে আপনি যখন এখানে

রয়েছেন, তখন আপনিও আপনার নিজের তরফ থেকে যা করতে চান, করতে পারেন। কেবল আমাদের যা কিছু ফাইন্ডিংস পরস্পরকে জানালে বোধহয় কাজের দিক দিয়ে সুবিধা হবে।

সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, বলল ফেলুদা। আর আপনাদের সাহায্য ছাড়া আমি এগোতেই পারব না।

সমীরণবাবু এসেছেন ঘরে, তাঁর মুখ ফ্যাকাসে, চুল উসকোখুসকো।

ফেলুদা তাঁর দিকে ফিরে বললেন, ব্যাপারটা তো আপনিই ডিসকভার করেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ, বললেন সমীরুণবাবু। বাবা ঘড়িতে অ্যালাম দিয়ে ঠিক পাঁচটায় উঠে গিয়ে বারান্দায় বসতেন। তার পর লোকনাথ চা এনে দিত। আজ সোয় পাঁচটায় বাবাকে জায়গায় না দেখে ভাবলাম ব্যাপার কী। খট্‌কা লাগল, তার পর বাবার শোবার ঘরে গেলাম। ঘরে ঢুকেই দেখি এই কাণ্ড।

এই খুন সম্বন্ধে আপনার কিছু বলার আছে? আপনার নিজের কোনও ধারণা হয়েছে এ সম্বন্ধে?

ফেলুদা প্রশ্ন করতে করতে ঘরটা পায়চারি করে দেখছে, কোনও কিছুই তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াচ্ছে না।

কেবল একটা কথা বলার আছে বললেন সমীরণবাবু।

কী?

ঘরে একটা জিনিস মিসিং।

কী জিনিস?

আমরা সকলেই কৌতুহলী দৃষ্টি দিলাম ভদ্রলোকের দিকে।

অষ্টধাতুর একটা বালগোপাল, বললেন সমীরণবাবু। এটা ছিল আমাদের নিয়নপুরের বাড়ির মন্দিরে। অনেক দিনের সম্পত্তি, এবং অত্যন্ত মূল্যবান জিনিস।

কোথায় থাকত এটা?

ওই তাকের উপর। ভুজালিটার পাশেই।

সমীরণবাবুঘরের একটা সেলফের দিকে ইঙ্গিত করলেন।

যতীশ সাহা বললেন, এমন একটা জিনিস সিন্দুকে না রেখে বাইরে রাখা হত কেন?

তার কারণ বাবা তো রাত্রে ঘুমোতেন না, আর সঙ্গে রিভলবার থাকত, তাই কোনও বিপদ আছে বলে মনে করেননি।

তা হলে তো রবারিই মোটিভই বলে মনে হচ্ছে, বললেন সাহা।জিনিসটার দাম কত হবে?

তা ষাট-পয়ষট্টি হাজার তো হবেই। সোনার অংশ বেশ বেশি ছিল।

ফেলুদা খাটের পাশের টেবিল থেকে একটা পেনসিল তুলে নিয়ে বলল, শিসটা ভাঙা, এবং ভাঙা টুকরোটা পাশেই পড়ে আছে।

আমি দেখলাম পেনসিলের পাশে একটা ছোট্ট প্যাডও রয়েছে।

ফেলুদা নিচু হয়ে প্যাডের উপরের কাগজটা দেখছিল। তারপর বিড়বিড় করে বলল, ওপরের কাগজটা ছিড়েছে বলে মনে হচ্ছে...

এবারে ও আরও নিচু হয়ে টেবিলের চার পাশের মেঝেটাি দেখতে লাগল। তারপর মেঝে থেকে একটা কাগজ তুলে নিয়ে বলল, পেয়েছি।

আমি দূর থেকেই বুঝলাম প্যাডের কাগজের উপর কী যেন একটা লেখা রয়েছে।

কাগজটা নিজে ভাল করে দেখে ফেলুদা সেটা সাহার দিকে এগিয়ে দিল। সাহা কাগজটা হাতে নিয়ে লেখাটা পড়ে চোখ কপালে তুলে বললেন, বিষ?

তই তো লিখছেন ভদ্রলোক, বলল ফেলুদা। আর যে ভাবে ষ-এর পেট কাটা হয়েছে, মনে হয় তার পরেই মৃত্যুটা হয়, এবং শিস ভেঙে পেনসিলটা হাত থেকে পড়ে যায়, আর কাগজটাও প্যাড থেকে আলগা হয়ে মাটিতে পড়ে।

কিন্তু বিষ কথাটা লিখবার অর্থ কী? বললেন সাহা, যেখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ছুরি দিয়ে মারা হয়েছে?

সেটাই তো ভাবছি, ভূকুটি করে বলল ফেলুদা। তারপর সমীরণবাবুর দিকে ফিরে বলল, মিঃ মজুমদারের ঘুমের ওষুধ কোথায় থাকত, জানেন?

ডাইনিং রুমে একটা বোতলের মধ্যে, বললেন সমীরণবাবু। দোকান থেকে এলেই লোকনাথ টিন-ফয়েল ছিঁড়ে বড়িগুলো বার করে বোতলে রেখে দিত।

সেই বোতলটা একবার আনতে পারেন?

সমীরণবাবুর ফিরে আসতে যেন একটু বেশি সময় লাগল। আর যখন এলেন তখন ভদ্রলোকের মুখ আরও ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

বোতল নেই, ধরা গলায় বললেন ভদ্রলোক।

ফেলুদার ভাব দেখে মনে হল সে যেন এটাই আশা করছিল। বলল, গত পরশু সন্ধ্যায় আমাদের সামনেই ভদ্রলোক একমাসের স্টক কিনলেন ওই ওষুধের। তারপর সাহার দিকে ফিরে বলল, এই বাড়ির খান ত্রিশেক একসঙ্গে একজন মানুষকে খাওয়ালে তার মৃত্যু হতে পারে না?

এটা কী বড়ি?

টফ্রানিল। অ্যান্টি-ডিপ্রেসান্ট পিল্‌স।

তা নিশ্চয়ই হতে পারে, বললেন সাহা।

এবং তখন সে বড়িকে বিষ বলা যেতে পারে না?

নিশ্চয়ই।

তা হলে বিষ কথাটার একটা মানে পাওয়া যাচ্ছে, যদিও...। ফেলুদার যেন খট্‌কা লাগছে। একটু ভেবে বলল, যে লোককে খুন করা হচ্ছে সে যদি মরার পূর্বমুহূর্তে কিছু লিখে যায় তা হলে কী ভাবে তাকে মারা হচ্ছে সেটা না লিখে সে যাকে আততায়ী বলে সন্দেহ করছে তার নামটাই লিখে যাবে না কি?

কথাটা আপনি ঠিকই বলেছেন, বললেন সাহা, কিন্তু এক্ষেত্রে ভদ্রলোক সেটা করেননি সেটা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে।..ভাল কথা, একবার বেয়ারা লোকনাথকে ডাকলে হত না?

ফেলুদা প্রস্তাবটা সমর্থন করে সমীরণবাবুর দিকে চাইল। সমীরুণবাবু ইঙ্গিতটা বুঝে নিয়ে লোকনাথের খোঁজে বেরিয়ে গেলেন।

ফেলুদার চোখ থেকে যে ভ্রূকুটি যাচ্ছে না সেটা আমি লক্ষ করছিলাম। লালমোহনবাবু বললেন, লোকনাথ দেড়টা নাগাত একবার দক্ষিণের বারান্দায় এসেছিল মিঃ মজুমদারকে ডাকতে। কিন্তু মিঃ মজুমদার তৎক্ষণাৎ যাননি।

তার মানে আজকে তাঁর নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম হয়েছিল, বলল ফেলুদা।

হ্যাঁ, বললেন লালমোহনবাবু।মনে হচ্ছিল ভদ্রলোক শুটিং-এর ব্যাপারটাতে বেশ ইন্টারেস্ট পাচ্ছিলেন। রায়না। আর ভার্মাকে সুযোগ পেলেই নানা রকম প্রশ্ন করছিলেন।

সমীরুণবাবু ঘরে ফিরলেন। তাঁর মুখ দেখেই বুঝলাম, খবর ভাল না। কিন্তু যা শুনলাম, ততটা তাজ্জব খবর আমি আশা করিনি।

লোকনাথকে পাওয়া যাচ্ছে না, বললেন সমীরুণবাবু।

পাওয়া যাচ্ছে না? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল ফেলুদা।

না, বললেন সমীরণবাবু। সে দেড়টার কিছু পর থেকেই মিসিং। চাকররা দুটো নাগাত খেত।–লোকনাথ খায়ওনি। কোথায় গেছে, কখন গেছে, কেউ বলতে পারছে না।

রজতবাবু তাকে কোথাও পাঠাননি তো?

না। উনি কিছু জানেনই না। বললেন, দুপুরের খাবার পর আধা ঘণ্টা বিশ্রাম করেই উনি ঝাউবনে বেড়াতে যান। এটা ওঁর একটা বাতিক আছে। উনি দুপুরে ঘুমোন না।

কথাটা যে সত্যি সেটা জানি। কারণ শুটিং-এ লঞ্চ ব্রেকের সময় আমি একবার ঝাউবনে গিয়েছিলাম ছোট কাজ। সারতে। তখন রজতবাবু ঝাউবন থেকে ফিরছিলেন।

এই লোকনাথ বেয়ারা কতদিনের? জিজ্ঞেস করলেন সাহা।

বছর চারেক, বললেন সমীরুণবাবু! আগের বেয়ার রঙ্গলাল খুব পুরনো লোক ছিল। সে হঠাৎ হেপাটাইটিসে মারা যায়। লোকনাথ খুব ভাল রেফারেন্স নিয়ে এসেছিল। একটু লিখতে-পড়তেও পারত। বাবার হবির ব্যাপারে রজতবাবুকে ও সাহায্য করত।

তা হলে তো মনে হচ্ছে ওকে খুঁজে বের করলেই আমাদের সমস্যার সমাধান হবে, বললেন সাহা।আপনাদের টেলিফোনটা একটু ব্যবহার করতে পারি?

নিশ্চয়ই, বলে সমীরণবাবু সাহাকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কিন্তু মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা-টা কেন দেওয়া হল, সেটা তো বুঝতে পারছি না ফেলুবাবু, বললেন লালমোহনাবু। চুরিই যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তা হলে তো সে কাজটা ত্রিশটা বড়ি খাইয়ে কেইশ করেই হয়ে যায়। আবার ছোরা কেন?

ফেলুদা বলল, মনে হয় শুধু বড়িতে আততায়ী নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। হয়তো যে সময় মূর্তিটা চুরি করতে এসেছিল, সেই সময় মজুমদার একটু নড়াচড়া করেছিলেন। বড়ির অ্যাকশন হতে তো সময় লাগে! এই নড়াচড়া দেখেই ঘাবড়ে গিয়ে ছোরাটা মারা হয়েছে। এবং তারপর মূর্তিটা সরানো হয়েছে।

কিন্তু তা হলে বিষটা কখন লেখা হল?

সেটা অবিশ্যি ছারা মারার আগেই হয়েছে-যখন মজুমদার প্রথম বুঝেছেন যে, তাঁকে কিছু একটা খাইয়ে বেষ্ট্রশ করার চেষ্টা হয়েছে। লেখাটা লিখেই উনি অন্তত সাময়িকভাবে সংজ্ঞা হারান। এ ছাড়া আর কোনও সমাধান আপাতত খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

ফেলুদা যে খুশি নয় সেটা আমি বুঝতে পারছিলাম।

সাহা ইতিমধ্যে ঘরে ফিরে এসেছিলেন; বললেন, আমার কাছে ইট সার্টেনলি মেক্স সেন্স।..যুক্ যে, আমি লোক লাগিয়ে দিয়েছি। ইতিমধ্যে অবিশ্যি আমার অন্য কাজ চালিয়ে যেতে হবে। আমি এ বাড়ির এবং ফিল্মের দলের সকলকে জেরা করতে চাই।

একটা কথা, বললেন লালমোহনবাবু।ফিল্মের দলের মধ্যে সকলের কিন্তু বাড়ির উত্তর দিকের বাথরুম ব্যবহার করার অধিকার ছিল না। সে অধিকার ছিল পরিচালক পুলক ঘোষালের, ক্যামেরাম্যান সুদেব ঘোষ, রায়না, ভার্মা, আর আমার।

তা হলে শুধু তাদেরই জেরা করা হবে, বললেন সাহা।

মানে, আমাকেও? ধরা গলায় প্রশ্ন করলেন লালমোহনবাবু।

তা তো বটেই, বলল ফেলুদা।সুযোগ যাদের ছিল, তাদের মধ্যে আপনি তো একজন বটেই।

সাহা বললেন, এ ছাড়া আছে বাড়ির লোক; অর্থাৎ–ভদ্রলোক সমীরণবাবুর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দিলেন।

সমীরণবাবু বললেন, অর্থাৎ আমি, রজতবাবু, চাকর বাহাদুর, আর রান্নার লোক জগদীশ।

ভেরি গুড।

৭. জেরা শেষ

পরদিন সকালে সাড়ে নটায় পুলক ঘোষাল আমাদের হোটেলে এলেন। আপনাদের জেরা শেষ? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল ভদ্রলোককে।

তা শেষ, বললেন পুলক ঘোষাল।কাল রাত সাড়ে নটায় ছাড়া পেয়েছি। কিন্তু কী ঝঞ্ঝাটে পড়া গেল দেখুন তো! যদিন না তদন্ত শেষ হচ্ছে, তদিন তো ও-বাড়িতে শুটিং বন্ধ। অবিশ্যি সমীরণবাবু বলেছেন যে সব মিটে গেলে ওঁদের বাড়িতে আবার কাজ করতে দেবেন, কিন্তু সেটা কবে তা কে বলতে পারে? কত টাকা লস্ হল আমাদের ভাবতে পারেন?

লালমোহনবাবু চুকচুক করে সহানুভূতি জানালেন।

তবে এটা ঠিক, বললেন পুলকবাবু, একটা প্রোডাকশনে বাধা পড়লে সচরাচর সে ছবি হিট হয়। আর, একটা কথা। আপনি জানবেন লালুদা-আপনার গল্পের মার নেই।

পুলকবাবু চলে যাবার আধা ঘণ্টার মধ্যেই ইনস্পেক্টর যতীশ সাহা এলেন। বললেন, নো পাত্তা অফ লোকনাথ বেয়ারা। আমরা শিলিগুড়িতে পর্যন্ত লোক লাগিয়ে দিয়েছি। তবে আমার মনে হয় ইট্‌স এ ম্যাটার অফ টাইম। এখন হয়তো কোনও ভুটিয়া বস্তিতে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে; সুনার আর লেটার ধরা পড়তে বাধ্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস লোকটা কলকাতায় যাবার তাল করেছে; সেইখানে ও মূর্তিটা পাচার করবে। আশ্চর্য-সিধে মানুষও লোভে পড়লে কী রকম বেঁকে যায়।

আপনার জেরা তো হয়ে গেছে শুনলাম, বলল ফেলুদা।

তা হয়েছে, বললেন সাহা।এতে একটা জিনিস প্রমাণ হল যে, ফিল্ম শুটিং-এর ব্যাপারে মানুষের কৌতুহলের সীমা নেই। বাড়ির প্রত্যেকটি লোক বেশ কিছুটা করে সময়

কাটিয়েছে শুটিং দেখে। মিঃ মজুমদার তাঁর রুটিন ব্রেক করলেন—ভাবতে পারেন? অথচ ওঁর জীবনটা চলত ঘড়ির কাঁটার মতো!

ফেলুদা বলল, সুযোগের ব্যাপারটা কী মনে হল? মোটিভটা এখন থাক।

এখানে অবিশ্যি দুটো ব্যাপার দেখতে হবে, বললেন সাহা।এক, দুধে বড়ি মেশানো, আর দুই, ছারা মেরে মূর্তি চুরি। দেড়টা নাগাত লোকনাথ দুধ রেডি করে মজুমদারকে খবর দিতে গোসূল। সে নিজেই ত্রিশটা বড়ি মেশাতে পারে। অথবা সে যখন ছিল না, তখন অন্য লোক কাজটা করতে পারে; রজতবাবু বললেন তখন উনি নিজের ঘরে শুয়ে বই পড়ছিলেন। সমীরণবাবুও বললেন তিনি নিজের ঘরে ছিলেন। এ সবের অবিশ্যি কোনও প্রমাণ নেই। চাকর বাহাদুর আর রান্নার লোক জগদীশ শুটিং দেখছিল। দিস ইজ এ ফ্যাক্ট।

আপনাদের ডাক্তার খুনের টাইম সম্বন্ধে কী বলেন?

বলছেন আড়াইট থেকে সাড়ে চারটার মধ্যে স্ট্যাবিংটা হয়েছে। ছুরিকাঘাতেই যে মৃত্যু হয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই, তা না হলে এত ব্রিডিং হত না।

লোকনাথ সম্বন্ধে কেউ কিছু বলতে পারল?

কেউ না। আসলে সকলের মনই শুটিং-এর দিকে পড়ে ছিল।

লালমোহনবাবু কিছুক্ষণ থেকেই উসখুসি করছিলেন; এবার বললেন, আমার জেরাটা এখন সেরে নিলেই ভাল হত না?

নিয়মমতে কালকেই সেরে নেওয়া উচিত ছিল। বললেন ইনস্পেক্টর সাহা, কিন্তু আপনি মিঃ মিত্তিরের বন্ধু বলে আর ইনসিস্ট করিনি। যাই হাক, এবার আপনি বলুন গতকালের ঘটনাগুলো।

আমি পৌঁছেছি নটায়, বললেন লালমোহনবাবু। তারপর মেক-আপ করতে লেগেছে। এক ঘণ্টা। যে ঘরে শুটিং, তার পাশেই দক্ষিণের বারান্দা; আমরা অভিনেতারা আমাদের ডাকের অপেক্ষায় সেখানেই বসেছিলাম। সেখানে একটা ব্যাপার হয়। মিঃ মজুমদার সাড়ে দশটা নাগাত একবার এসে রায়না। আর ভার্মাকে ডেকে ভিতরে নিয়ে যান মিনিট পাঁচেকের জন্য। পরে রায়না আমাকে বলে যে, মজুমদার তাঁদের একটা মূল্যবান পৈতৃক সম্পত্তি দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। এখন বুঝতে পারছি সেটা ছিল ওই বালগোপালটা।

তারপর? প্রশ্ন করলেন সাহা।

তারপর এগারোটার সময় আমার আর ভার্মাির ডাক পড়ে। আমরা দুজনে শুটিং-এর ঘরে গিয়ে হাজির হই। দশ মিনিটের মধ্যে শটু আরম্ভ হয়। লাঞ্চের আগে চারটে শর্ট হয়। তার মধ্যে দ্বিতীয় শটের পর সাড়ে কারোটা নাগাত আমি একবার বাথরুমে যাই।

তখন আর কাউকে দেখেছিলেন কি?

না। বাথরুম থেকে ফেরার কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমাকে রিহসালের জন্য ডাকা হয়। আধা ঘণ্টার মধ্যেই তিন নম্বর শষ্ট্র হয়। তারপর আমার বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম ছিল। সেই সময়টা আমি দক্ষিণের বারান্দায় বসেছিলাম।

একা?

আমার সঙ্গে রায়না আর ভার্মা ছিল, আর মিঃ মজুমদার এসেছিলেন কিছুক্ষণের জন্য। ওঁকে লোকনাথ খবর দিতে আসে ওঁর দুধ রেডি আছে বলে। তার পাঁচ-সাত মিনিট পরে মজুমদার চলে যান। পৌনে দুটোর সময় আমার ডাক পড়ে চার নম্বর শটের জন্য। এটা ছিল শুধু আমার একার শট। এর পরেই আড়াইটায় লাঞ্চ ব্রেক হয়। তখন আমি একবার বাথরুম যাই হাত ধুতে। আমার সঙ্গে রায়না আর ভার্মাও গিয়েছিল।

কে প্রথমেহাত ধোয়?

আমি। তারপর আমি চলে আসি। খেতে সবসুদ্ধ মিনিট কুড়ি লাগে। তারপর আমি বারান্দাতেই বসেছিলাম। তপেশা ছিল আমার সঙ্গে।

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

লালমোহনবাবু বলে চললেন, এই সময়টা রায়না। আর ভার্মা কোথায় ছিল লক্ষ করিনি। তিনটের সময় আবার কাজ শুরু হয়। আমার পাঁচ নম্বর শট শেষ হয় সাড়ে তিনটেয়। তার পর আলো চেঞ্জ করার জন্য প্রায় পঁয়ত্রিশ মিনিটের একটা বিরতি ছিল।

তখন আপনি কী করছিলেন?

আমি, রায়না আর ভার্মা দক্ষিণের বারান্দায় বসে গল্প করছিলাম। তপেশও ছিল। কাছাকাছি বসে।

আমি আবার সায় দিলাম।

ভার্মা ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় ঘুরেছে। ওঁর অভিজ্ঞতা বলছিলেন আমাদের।

এই পুরো সময়টাই কি আপনারা তিনজনে একসঙ্গে ছিলেন? লালমোহনবাবু একটু ভুরু কুঁচকে ভাবলেন। তারপর বললেন, ভার্মা বোধহয় একবার উঠে গিয়েছিল মিনিট পাঁচেকের জন্য। তখন রায়না বোম্বাই ফিল্ম জগতের গসিপ শোনাচ্ছিলেন। তারপর–

আর দরকার নেই, এতেই হবে, বললেন ইনস্পেক্টর। তবে লোকনাথকে যে বিকেলের দিকে আর দেখেননি, সেটা আপনার মনে আছে?

লোকনাথ... লোকনাথ..উঁহু, লোকনাথকে আর দেখিনি।

থ্যাঙ্ক ইউ স্যার, বলে সাহা উঠে পড়লেন। তার পর আমার দিকে ফিরে বললেন, তুমিও তো ছিলে ওখানে?

আমি মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললাম।

লালমোহনবাবু যা বলেছেন, সবই ঠিক বলেছেন। আমি শুধু একবার আড়াইটের সময় পিছনে ঝাউবনে যাই বাথরুম সারতে। তখন রজতবাবুকে দেখি, উনি বাড়ির দিকে ফিরছেন। দেখে মনে হল যেন একটু হাঁপাচ্ছেন।

সাহা বললেন, ভদ্রলোক জেরাতেও বলেছিলেন যে, মাঝে মাঝে দুপুরে খেয়ে একটু বিশ্রাম করে উনি ঝাউবনে বেড়িয়ে আসেন। গতকালও গেছেন বলে বলছিলেন। ভাল কথা, দুপুরে যে লাঞ্চটা হত, তাতে কি শুধু ফিল্মে যারা কাজ করছে তারাই অংশগ্রহণ করত।

আজ্ঞে হ্যাঁ, বললেন লালমোহনবাবু।

সমীরণবাবু আর রজতবাবুকেও আফার করেছিল পুলক, কিন্তু ওঁরা রাজি হননি।

ভাল কথা, বললেন সাহা। ভুজালির হাতলে কোনও আঙুলের ছাপ পাওয়া যায়নি।

ফেলুদা বলল, সেটা বোধহয় আশাও করা যায়নি। কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন ছিল আপনাকে।

কী প্রশ্ন?

খুনের টাইমটা সাড়ে চারটে হওয়ার চেয়ে আড়াইটা হওয়াই বেশি স্বাভাবিক বলে মনে হয় না কি?

কেন বলুন তো?

ধরুন যদি লোকনাথই অপরাধী হয়, সে স্বভাবতই যত তাড়াতাড়ি পারে তার কাজ সেরে ফেলবে। দেড়টায় সে বড়ি মিশিয়েছে দুধে—আটাশখানা—তারপর তিন ঘণ্টা পর্যন্ত সে

অপেক্ষা করবে। কেন? যদি মূর্তিটা নেবার সময় সে ছারা মেরে থাকে-যেটা স্বাভাবিক।-তা হলে সেটা এত পরে করবে কেন?

গুড পয়েন্ট, বললেন সাহা।অবিশ্যি আড়াইটায় খুনটা হলে সেটা ডাক্তারের রিপোর্টের বিরুদ্ধে যায় না।

ইনস্পেক্টর সাহা উঠে পড়লেন। বললেন, তাঁকে একবার নয়নপুর ভিলায় যেতে হবে। ঘর থেকে বেরোবার সময় ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন, আপনার চোখ থেকে ভ্রূকুটি যাচ্ছে না কেন বলুন তো?

ফেলুদা বলল, ওটা কিছু না। আসলে আমি খুব জটিল কেস হ্যাঁন্ডেল করে অভ্যস্ত। এটা কেমন যেন বেশি সরল বলে মনে হচ্ছে। এটা আমার কাছে একটা নতুন অভিজ্ঞতা, তাই সেটাকে সহজে গ্রহণ করতে পারছি না।

এ আবার আপনার বাড়াবাড়ি মশাই, বললেন সাহা। আমরা সহজ কেস হলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচি, আর আপনি দেখছি তার ঠিক উলটা। এইখানেই পুলিশ আর শখের গোয়েন্দার তফাত।

সাহা চলে গেলেন, কিন্তু ফেলুদার কপালে দুশ্চিন্তার রেখা রয়েই গেল। ও শেষে বলল, একটা সামান্য সহজ জিনিস নিয়ে এত ভাবার কোনও মানেই হয় না। লোকনাথকে খুঁজে বার করবে পুলিশ; সেখানে আমার কিছু করারই নেই। চল, একটু বেড়িয়ে আসি ম্যালে।

আজকের দিনটা কুয়াশাচ্ছন্ন, তার ফলে শীতটাও একটু বেশি, তাই বোধহয় ম্যালে বেশি লোক নেই। আমরা তিনজন এগিয়ে একটা খালি বেঞ্চিতে বসলাম।

ভারী অদ্ভুত লাগছে কুয়াশার মধ্যে ম্যালটাকে। এতই কুয়াশা যে দশ হাত দূরের লোককে দেখা যায় না। কাছে এলে মনে হয়। হঠাৎ যেন শূন্য থেকে বেরিয়ে এল। সেই ভাবেই

বেরিয়ে এলেন একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক, আর তিনি এগিয়ে এলেন আমাদের দিকেই। তারপর ফেলুদার দিকে চেয়ে হাত দুটো জোড় করে বললেন, নমস্কার!

৮. পরিচয় হয়েছিল আমাদের

পরিচয় হয়েছিল আমাদের—আপনার মনে আছে বোধহয়?

হ্যাঁ হ্যাঁ—আপনার নাম তো হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়?

বাঃ, আপনার মেমরি তো বেশ শার্প দেখছি। তা, একটু বসতে পারি আপনাদের পাশে?

নিশ্চয়ই।

ফেলুদা ওর নিজের আর লালমোহনবাবুর মাঝখানে একটু জায়গা করে দিল। ভদ্রলোক বসলেন।

আপনি তো নয়নপুর ভিলার পাশেই থাকেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ। উত্তর দিকের বাড়িটা আমার। আমি আছি। এখানে প্রায় এগারো বছর।

আপনার বাড়ির পাশেই তো একটা ট্র্যাজিডি হয়ে গেল।

তা তো বটেই, বললেন ভদ্রলোক। কিন্তু এর একটা আঁচ তো আগে থেকেই পাওয়া গোস্‌ল, তাই নয় কি?

আপনার তাই মনে হয়?

এ কথা বলছি, কারণ বিরূপাক্ষ মজুমদারকে আমি অনেক দিন থেকেই চিনি। ঘনিষ্ঠ আলাপ ছিল বলতে পারি না, কারণ মজুমদার যে খুব মিশুকে লোক ছিলেন তা নয়। কিন্তু তাঁর বিষয়ে আমি জানি অনেক দিন থেকেই।

কী করে জানলেন?

আমি এককালে বছর দশেক ছিলাম মধ্যপ্রদেশের নীলকণ্ঠপুরে। আমার পেশা ছিল জিওলজি। ইট পাথর নিয়ে কারবার ছিল আমার। সেই নীলকণ্ঠপুরে একবার আসেন। বিরূপক্ষ মজুমদার। তখন ওঁর বয়স ছিল হয়তো পয়ত্রিশ-ছত্রিশ। শিকারের খুব শখ ছিল ভদ্রলোকের। নীলকণ্ঠপুরের রাজা পৃথ্বী সিং মজুমদারকে আমন্ত্রণ জানান তাঁর জঙ্গলে গিয়ে শিকার করার জন্য। পরস্পর আলাপ ছিল আগে থেকেই! এই দুই শিকারির মধ্যে একটা মিল ছিল। সেটা এই যে, কেউই মাচার উপর থেকে শিকার করতে চাইতেন না। এমনকী হাতির পিঠ থেকেও না। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল বিটারদের সাহায্য না নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সোজা হেঁটে গিয়ে বাঘ শিকার করা। এই শিকার থেকেই হয় এক চরম দুর্ঘটনা।

কী রকম?

বাঘের বদলে মানুষের উপর গুলি চালান বিরূপাক্ষ মজুমদার।

সে কী!

ঠিকই বলছি।

মানে, কোনও স্থানীয় অধিবাসী-টাসী-?

না। তা হলে তো তবু কথা ছিল। যিনি মরেছিলেন, তিনি ছিলেন ভদ্রলোক এবং বাঙালি। নাম সুধীর ব্রহ্ম। বাঙালি হলেও বাপের আমল থেকে মধ্যপ্রদেশবাসী। পেশা ছিল নীলকণ্ঠপুর রাজ কলেজে ইতিহাসের প্রফেসারি, কিন্তু প্রচণ্ড শখ ছিল কবিরাজির। রাজা এবং মজুমদার যে সময় বাঘ খুঁজছিলেন, সেই সময় ব্রহ্ম ঘুরছিলেন জঙ্গলে গাছড়ার অনুসন্ধানে। তাঁর গায়ে একটা গেরুয়া চাদর ছিল। একটা ঝোপের পাতা নড়তে দেখে আর ঝোপের ফাঁক দিয়ে গেরুয়া দেখে বাঘ ভেবে গুলি চালান বিরূপাক্ষ মজুমদার। সে গুলি গিয়ে লাগে সুধীর ব্রহ্মের পেটে। তৎক্ষণাৎ মৃত্যু।

এ খবর যাতে না ছড়ায়, তার জন্য বিস্তর টাকা খরচ করতে হয়েছিল পৃথ্বী সিং-কে। আমি নিজে জানি, কারণ আমি ছিলাম। ব্রক্ষের বন্ধুস্থানীয়। মজুমদার কলঙ্কের হাত থেকে পার পায় ঠিকই, কিন্তু সে যে অপরাধী, সে যে হত্যকারী, বাঘ মারতে সে যে মানুষ মেরে ফেলেছিল, তাতে তো কোনও সন্দেহ নেই। এই অপরাধের বোঝা বয়ে মানুষ কত দিন বেঁচে থাকতে পারে?

আপনার কি মনে হয় এবার যে-খুন হয়েছে তার সঙ্গে এই দুর্ঘটনার কোনও যোগ আছে?

একটা ব্যাপার আছে। আপনি গোয়েন্দা, আপনি হয়তো বর্তমানে হত্যা নিয়ে ভাবছেন, তাই আপনাকে বলছি। সুধীর ব্রক্ষর একটি ছেলে ছিল, নাম রমেন ব্রক্ষ। এই দুর্ঘটনা যখন ঘটে তখন ছেলেটির বয়স ষোলো। সে কিন্তু এই ধামা চাপা দেওয়ার ব্যাপারটাকে মোটেই বরদাপ্ত করতে পারেনি। আমাকে কাকা বলে সম্বোধন করত। রমেন। সেই সময়ই সে বলেছিল যে বড় হয়ে সে এই হত্যার প্রতিশোধ নেবে। এখন তার বয়স হওয়া উচিত আটত্রিশ।

আপনার সঙ্গে সে যোগাযোগ রেখেছিল?

না। আমি নীলকণ্ঠপুর ছাড়ি আজ থেকে বিশ বছর আগে। কিছুকাল ছোট নাগপুরে ছিলাম। তারপর রিটায়ার করে চলে আসি দার্জিলিং-এ। আমার বাড়িটা আপনার চোখে পড়েছে কিনা জানি না। ছোট্ট কটেজ বাড়ি; আমি আর আমার স্ত্রী থাকি; আমার একটি ছেলে, সে কলকাতায় প্লিডার; একটি মেয়ের বিয়ে হয়ে বাইরে রয়েছে।

আপনার কি ধারণা, সুধীর ব্রক্ষের সেই ছেলে এখন এখানে রয়েছে?

তা বলতে পারব না; আর বাইশ বছর পরে তাকে দেখলে হয়তো চিনতেও পারব না। কিন্তু সে বাপের হত্যার প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর ছিল সে কথা আমি জানি।

ভদ্রলোক যে ঘটনাটা বললেন, সেটা যে খুবই আশ্চর্য তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এটা বুঝতে পারছিলাম যে, এ কাহিনী ফেলুদাকে নতুন করে ভাবাবে।

ফেলুদা বলল, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। সে ছেলে যদি এখন এখানে নাও থাকে, মিঃ মজুমদারের জীবনে যে এমন একটা ঘটনা ঘটেছে এটা শুনে খুবই অবাক লাগছে। তাঁর জীবনে যে কোনও একটা গোলমেলে ব্যাপার ঘটেছিল সে রকম ইঙ্গিত দু-একবার পেয়েছি, এমনকী আপনিও দিয়েছেন, কিন্তু সেটা যে এমন একটা ঘটনা তা ভাবতে পারিনি। আর আপনি নিজেই যখন সে সময় নীলকণ্ঠপুরে উপস্থিত ছিলেন, তখন এটা অবিশ্বাস করার কোনও কারণ থাকতে পারে না।

হরিনারায়ণবাবুর সঙ্গে আমরাও উঠে পড়লাম। ফেলুদার কপালে নতুন করে ভূকুটি দেখা দিয়েছে। আমার মন বলছে এবার আর কেসটিকে তেমন সহজ বলে মনে হচ্ছে না। ফেলুদার। খানিকটা পথ কুয়াশার মধ্যে দিয়ে হেঁটে ও বলল, এই কাহিনী আমার চিন্তাকে সাহায্য করবে না ব্যাহত করবে। সেটা বুঝতে পারছি না। এখন এই শহরের অবস্থা যেমন, আমার মনের অবস্থাও ঠিক সেই রকম। একরাশ কুয়াশা এসে চিন্তাশক্তিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। যদি একটু সূর্যের আলো দেখতে পেতাম!

আমরা হাঁটতে হাঁটতে অবজারভেটরি হিল রোডের পুব দিকটায় এসে পড়লাম। বুঝতে পারছিলাম ফেলুদার মনের ভিতরটা ছটফট করছে, তাই সে এক জায়গায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না।

কুয়াশার মধ্যেই একজন নেপালি একটা ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে এল, পিঠে কোনও সওয়ার নেই।বাবু ঘোড়া লেগা, ঘোড়া? বলে উঠল লোকটা, কিন্তু আমরা তাকে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে গেলাম। সামনে বাঁয়ে ঘুরে গেছে রাস্তাটা, ডাইনে খাদ, আমরা সে খাদ বাঁচিয়ে রাস্তার বা দিক ঘেঁষে চলেছি। রাস্তার পাশের রেলিংটা প্রায় দেখা যাচ্ছে না। কুয়াশায়। পরিষ্কার দিনে এখন থেকে সামনে উত্তরে পুরো কাঞ্চনজঙ্ঘার লাইনটা দেখা যায়; আজ আমাদের চার দিক থেকে ঘিরে রয়েছে একটা দুর্ভেদ্য সাদা দেয়াল।

এবার পাশের রেলিংটা ফুরিয়ে গেছে। এখন ডাইনে রাস্তার ধারেই খাদ। আমরা এখনও পাহাড়ের দিক ঘেঁষে চলেছি, যদিও দেখছি ফেলুদা, মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে একটু বেশি ডান দিকে চলে যাচ্ছে। লালমোহনবাবু খালি বলছেন, মিস্টিরিয়াস, মিস্টিরিয়াস...। তারপর একবার বললেন, মশাই, মিস্ট থেকেই মিস্ত্রি আর মিস্টিরিয়াস এসেছে নাকি?

হঠাৎ আমাদের পিছনে ফিরতে হল, কারণ দ্রুত পায়ের শব্দ পেয়েছি। কিন্তু কই, এখনও তো কাউকে দেখা যাচ্ছে না! অথচ পায়ের শব্দটা এগিয়ে আসছে। তারপর হঠাৎ কুয়াশার ভিতর থেকে একটা ছায়ামূর্তি বেরিয়ে এল। তার মুখ ভাল করে দেখার আগেই সে মূর্তি ফেলুদাকে সজোরে মারল একটা ধাক্কা খাদের দিকে। ফেলুদা টাল সামলাতে না পেরে পাহাড়ের গা দিয়ে গড়িয়ে মুহূর্তের মধ্যে নীচে অদৃশ্য হয়ে গেল-চারিদিক কুয়াশায় কুয়াশা!

ইতিমধ্যে মূর্তিও আবার কুয়াশায় মিলিয়ে গেছে, সেই সঙ্গে মিলিয়ে গেছে তার দ্রুত পায়ের শব্দ।

লালমোহনবাবুর আর্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম কী সাংঘাতিক একটা ঘটনা ঘটে গেল।

আর সেই সঙ্গে দুটো নেপালি সামনের কুয়াশা থেকে বেরিয়ে এল, আর আমাদের দেখেই জিজ্ঞেস করল, কেয়া হুয়া, বাবু?

আমরা বললাম কী হয়েছে। আমাদের সঙ্গের লোক খাদে পড়ে গেছে জেনেই তারা দুজন অনায়াসে পাহাড়ের গা দিয়ে নীচে নেমে গেল—এক মিনিট ঠাহরিয়ে বাবু, হাম দেখতা হ্যায় কেয়া হুয়া।

লোক দুটোও কুয়াশার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল, কিন্তু সেই মুহূর্তেই কুয়াশাও হঠাৎ পাতলা হয়ে চারদিকে সব কিছু যেন আবছা আবছা দেখা যেতে লাগল। কে যেন একটা ফিন্‌ফিনে চাদর টেনে সরিয়ে নিচ্ছে সমস্ত দৃশ্যের উপর থেকে।

নীচে ওটা কী?

একটা গাছ। রডোডেনড্রন বলেই তো মনে হচ্ছে। তার গুঁড়ির সঙ্গে লেগে একটা মানুষ পড়ে আছে। ফেলুদা! ওই যে তার খাকি জার্কিন আর লাল-কালো চেক্ মাফলার।

নেপালি দুটো মুহূর্তের মধ্যে পাহাড়ের গা দিয়ে নেমে গেছে, তার পর ফেলুদাকে দু হাতে ধরে তুলতেই যেন ফেলুদারও হুঁশ ফিরে এসেছে।

ফেলুদা?

ফেলুবাবু!

আমাদের দুজনের ডাকের উত্তরে ফেলুদা তার ডান হাতটা তুলে আশ্বাস দিল যে সে ঠিকই আছে।

তারপর সে খাড়াই দিয়ে উঠে এল দুই নেপালির সাহায্যে-আমাদের চরম বিপদের সময় দুই আচমকা বন্ধু।

পাঁচ মিনিটের কসরত ও চেষ্টার পর ফেলুদা পৌঁছে গেল আমাদের কাছে—সে হাঁপাচ্ছে, তার কপাল ছড়ে গিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে, হাতেও আঁচড় লেগেছে, তাতে রক্তের আভাস।

বহুৎ সুক্রিয়া! ফেলুদা বলল তার উদ্ধারকারীদের।

তারা দুজনে চাপড় মেরে ফেলুদার গা থেকে ধুলো ঝেড়ে দিয়ে বলল, ম্যালের মোড়েই ডাক্তণরখানা আছে, সেখানে এক্ষুনি গিয়ে যেন ফেলুদা ফাস্ট এডের ব্যবস্থা করে।

আমাদেরও সে মতলব ছিল। আমরা হাঁটা দিলাম আবার ম্যালের দিকে।

লোকটা কে ছিল বুঝতে পারলে তপেশ? লালমোহনবাবু জিজ্ঞেস করলেন। আমি মাথা নাড়লাম। সত্যি বলতে কী, চাপ দাড়ি ছাড়া আর কিছুই দেখিনি আমি। আর দাড়িটাও মনে হচ্ছিল নকল।কী রকম বোধ করছেন? জটায়ু জিজ্ঞেস করলেন ফেলুদাকে।

বিধ্বস্ত, বলল ফেলুদা। ওই গাছটাই আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে, না হলে হাড়গোড় সব চুরমার হয়ে যেত। কিন্তু মনে হচ্ছে, এবার আস্তে আস্তে মাথা খুলে যাবে। একটা জোরালো কুঁ তো এর মধ্যেই পেয়েছি। আমার এ রকমই হয়, জানেন, এ রকমই হয়। এটার দরকার ছিল। আর এটাও বুঝলাম যে, কেসটা মোটেই সরল নয়।

৯. ফেলুদার জখম

ফেলুদার জখম যে তেমন গুরুতর হয়নি সেটা ডাক্তারখানায় গিয়েই বোঝা গেল। ডাক্তার বর্ধন বসেন ডিসপেনসারিতে, তিনিই ফাস্ট এন্ড দিয়ে দিলেন। ভদ্রলোক স্বভাবতই ঘটনাটা জানতে চাইলেন, আর আমাদেরও বলতে হল।

কিন্তু আপনার ওপর এ আক্রমণের কারণ কী? জিজ্ঞেস করলেন বর্ধন।

এর ফলে ফেলুদাকে নিজের পরিচয় দিতে হল। তাতে ভদ্রলোকের চোখ কপালে উঠে গেল! বললেন, আপনিই স্বনামধন্য গোয়েন্দা প্রদোষ মিত্র? আমি তো আপনার অনেক কীর্তির বিষয়ে পড়েছি মশাই! চাক্ষুষ পরিচয় যে হবে সেটা কোনওদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।..কিন্তু আপনি কি মিঃ মজুমদারের খুনের তদন্ত করছেন নাকি?

ঘটনাচক্রে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে, বলল ফেলুদা!

ভদ্রলোক তো আমারই পেশেন্ট ছিলেন, বললেন ডাঃ বর্ধন।

তাই বুঝি?

ইয়েস। আশ্চর্য মনের জোর ছিল মিঃ মজুমদারের। দেখে বোঝাই যেত না যে ওঁর ওপর দিয়ে এত ঝড় বয়ে গেছে, এবং এখনও যাচ্ছে। নিজের হবি নিয়ে মেতে থাকতেন, আর ঘোড়া চড়ে ঘুরে বেড়াতেন।

কিন্তু ঝড়ের কথা কী বলছেন একটু জানতে পারি কি?

একে তো ওঁর নিজের অসুখ ছিল। তারপর স্ত্রীকে হারান বছর সাতেক আগে। ভদ্রমহিলার ক্যানসার হয়েছিল। তার উপর পুত্রের সমস্যা।

সমীরণবাবুর কথা বলছেন?

এত গুণ ছিল ছেলেটির, কিন্তু শেয়ার বাজারের খেলা খেলতে গিয়ে সব গেছে। এখন দেনার জালে জড়িয়ে পড়েছে; একটিমাত্র ছেলে, তাই ভাবতে কষ্ট হয়। আমি তো ওঁর ডাক্তার ছিলাম, তাই সুখ-দুঃখের অনেক কথাই আমাকে বলতেন। এবারও যে ছেলে এসেছে, আই অ্যাম শিওর তার কারণ বাপের কাছে হাত পাতা। কিন্তু আমি যতদূর জানি বাবা সম্প্রতি ছেলের উপর রীতিমতো বিরূপ হয়ে উঠেছিলেন। একটা আলটিমেটাম দিয়ে থাকলেও আশ্চর্য হব না। সমস্ত ব্যাপারটা কালিমাময়, আনপ্লেজেন্ট। আমার ভাল লাগছে। না। খুনের কথাটা শুনে অবধি আমার মনে একটা আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। আমি সেটা কাটিয়ে উঠতে পারছি না।

ভদ্রলোক উইল করে গেছেন কি না জানেন?

তা জানি না। তবে করে থাকলে ছেলেকেই নিশ্চয় সব কিছু দিয়ে গেছেন—যদি না ইতিমধ্যে উইল বদলে থাকেন।

ফেলুদা ডাঃ বর্ধনকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে উঠে পড়ল। অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও ভদ্রলোক একটি পয়সাও নিলেন না। আসবার সময় ফেলুদা বলল, আপনি যে আমার কত উপকার করেছেন, তা আপনি জানেন না। ফাস্ট এন্ড নিতে এসেছিলাম, তার সঙ্গে আরও অনেক এত পেয়ে গেলাম!

বাইরে বেরিয়ে এসে ফেলুদা বলল, তোরা যদি বিশ্রাম করতে চাস তো হোটেলে ফিরে যেতে পারিস। আমি কিন্তু এখন একটু নয়নপুর ভিলায় যাব। আজকের জানা সব নতুন তথ্য মাথায় রেখে নতুন করে তদন্ত শুরু করতে হবে। আমার চোখে কেসটা এখন একেবারে নতুন চেহারা নিয়েছে।

আমরাও দুজনেই অবিশ্যি সঙ্গেই যেতে চাইলাম। ও যদি এত ধকলের পরও বিশ্রাম ছাড়া চলতে পারে তা হলে আমরা তো পারবই। সত্যি, আশ্চর্য শক্ত শরীর ফেলুদার। পাহাড়ের গা গড়িয়ে প্রায় একশো ফুট নীচে চলে গিয়েছিল।

আমরা নয়নপুর ভিলায় যখন পৌঁছলাম তখন কুয়াশা প্রায় কেটে গেছে। সমস্ত বাড়িটায় একটা থমথমে ভাব, যদিও চারিদিকের আশ্চর্য সুন্দর দৃশ্য যেমন ছিল তেমনই আছে। নুড়ির ওপর আমাদের পায়ের শব্দ শুনেই বোধহয় রজতবাবু ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। ফেলুদা তাঁকে নমস্কার জানিয়ে বলল, আপনার যে হাত খালি খালি লাগছে সেটা বেশ বুঝতে পারছি। আমাদের কতকগুলো কাজ ছিল, সেই ব্যাপারে আপনি যদি আমাদের একটু সাহায্য করেন...

কী কাজ বলুন।

আমরা একবার মিঃ মজুমদারের কাজের ঘরটা দেখতে চাই। তারপর আপনার ঘরটাও একটু দেখব। অবিশ্যি তার সঙ্গে কিছু প্রশ্নও করতে হবে।

বেশ তো, চলুন।

সমীরণবাবুকে দেখছি না-?

উনি বোধহয় স্নান করতে গেছেন।

তা হলে চলুন মিঃ মজুমদারের স্টাডিতেই বসা যাক্।

আমরা চারজনে বাড়ির উত্তর দিকের পিছনের অংশে একটা ঘরে গিয়ে হাজির হলাম। বেশ সুসজ্জিত, পরিষ্কার ঘর, পুবের জানালা দিয়ে বাড়ির পিছনের ঝাউবন দেখা যায়। জানালার সামনে একটা বেশ বড় মেহগনি টেবিল, তার পিছনে একটা আর সামনে দুটো ভারী চেয়ার; এ ছাড়া, ঘরের পশ্চিম অংশেও আলাদা বসবার ব্যবস্থা রয়েছে। একটা সোফা আর দুটো মুখোমুখি আর্ম চেয়ার। আমরা সেখানেই বসলাম! ফেলুদার বসবার

তাড়া নেই, সে ঘরটা ঘুরে ঘুরে দেখছে। টেবিলের উপর থেকে পেপারকাটার তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল।

এটায় তো বেশ ধার দেখছি, বলল ফেলুদা, এই দিয়েও তো মানুষ খুন করা যায়।

লালমোহনবাবু বললেন, ওর একটা জোড়া নাকি ওঁদের শুটিং-এ ব্যবহার হচ্ছে। এটা দিয়ে ভিলেনকে পিঠ চুলকোতে দেখানো হয়েছে।

সত্যিই ছুরিটাকে দেখলে বেশ ধারালো মনে হয়। ফেলুদা সেটা আবার টেবিলের উপর রেখে দিল।

ঘরের এক দিকে একটা বুক-শেলফে সারি সারি বড় খাতা দাঁড় করানো রয়েছে, তার দুটো আমরা এর আগেই দেখেছি। এগুলোতেই সেই সব খুনখারাবির খবর সাঁটা আছে। ফেলুদা তার আরও দু-একটা উলট-পালটে দেখল। তারপর প্রশ্ন করল, আপনি আসার আগে এগুলো কে সাঁটত?

মিঃ মজুমদার নিজেই।

আপনি আসার পর থেকে তো উনি সে কাজটা আপনার উপরই ছেড়ে দিয়েছিলেন?

হ্যাঁ, তবে আমাকে লোকনাথ মাঝে মাঝে সাহায্য করত।

লোকনাথ বেয়ারা?

হ্যাঁ। লোকনাথ স্কুল ফাইনাল পাশ করেছে। সে রীতিমতো লিখতে-পড়তে পারে।

এটা একটা অপ্রত্যাশিত খবর। তবে, পড়াশুনা করে সে বেয়ারার কাজ কোন নিল, সেটা বলতে পারেন?

মিঃ মজুমদার ওকে খুব ভাল মাইনে দিতেন।

আর সে বেয়ারাই শেষকালে এমন একটা কাজ করল?

ফেলুদা ঘুরে ঘুরে এটা সেটা দেখছে আর প্রশ্ন করে চলেছে।

আপনি এখানে আসার আগে কী করতেন?

একটা দিশি ফর্মে চাকরি করতাম?

কোথায়?

কলকাতায়।

ক বছর করেছিলেন এই কাজ?

সাত বছর।

মিঃ মজুমদার কি সেক্রেটারি চেয়ে বিজ্ঞাপন দেন?

হ্যাঁ। আপনি কদ্দূর পড়েছেন?

আমি বি কম পাশ।

আপনার ফ্যামিলি নেই?

আমি বিয়ে করিনি। বাবা-মা মারা গেছেন।

ভাই-বোন নেই?

না।

তার মানে আপনি একা মানুষ?

হ্যাঁ।

এই ছবিটা কী ব্যাপার?

একটা শেলফের উপর একটা বাঁধানো ছবি টাঙানো ছিল। একটা গ্রুপ ছবি; দেখে মনে হয় আপিসের গ্রুপ, সবসুদ্ধ জনা পয়ত্রিশ লোক, কিছু পিছনের সারিতে দাঁড়িয়ে, বাকি সামনের চেয়ারে বসে।

ও ছবিটা বেঙ্গল ব্যাঙ্কে তোলা, বললেন রজতবাবু। একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টর চলে যাচ্ছিলেন, তাঁকে ফেয়ারওয়েল দেবার দিন ছবিটা তোলা হয়েছিল। মিঃ মজুমদার তখন ডেপুটি ডিরেক্টর ছিলেন।

ফেলুদা ছবিটা হাতে নিয়ে মন দিয়ে দেখল।

কোনজন কে-সেটা লেখা নেই ছবিতে? মিঃ মজুমদারকে তো চিনতেই পারছি।

ছবির তলার দিকে থাকতে পারে। হয়তো বাঁধানোর সময় মাস্কেল্প নীচে ঢাকা পড়ে গেছে।

এটা আমার কাছে দু-তিন দিন রাখতে পারি?

নিশ্চয়ই।

ফেলুদা ছবিটা আমার হাতে চালান দিল। আমি আর লালমোহনবাবু সেটা দেখলাম। আপিসের গ্রুপ যেমন হয় তেমনই ব্যাপার। মিঃ মজুমদার প্রথম সারিতে চেয়ারে বসে আছেন বোধহয় ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পাশে।

ফেলুদা বলল, খুনের দিন সকালবেলা আপনি কখন কী করছিলেন সেটা জানা দরকার।

প্রশ্নটা করে ফেলুদা কোটের পকেট থেকে তার খাতাটা বার করে একটা পাতা খুলে তাতে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর বলল, সাড়ে এগারোটার সময় মিঃ মজুমদার তাঁর স্টাডিতে আসতেন। তখন আপনার তাঁর সঙ্গে থাকতে হত। সাড়ে বারোটা পর্যন্ত কাজ চলত, তাই না?

হ্যাঁ।

সেদিন কী কাজ ছিল?

মিঃ মজুমদারের অনেক চেনা পরিচিত ছিল দেশ-বিদেশে। উনি তাঁদের নিয়মিত চিঠি লিখতেন। তাতেই বেশির ভাগ সময় কেটে গেছিল সেদিন।

সাড়ে এগারোটার আগে সকালে আপনি কী করছিলেন?

ব্রেকফাস্টের কিছু পরেই শুটিং-এর দল আসতে শুরু করে। আমি দক্ষিণের বরান্দায় গিয়ে ওদের তোড়জোড়ের কাজ দেখছিলাম।

কোনও শট নেওয়া দেখছিলেন?

প্রথমটা দেখেছিলাম। মিঃ গাঙ্গুলী আর মিঃ ভার্মাকে নিয়ে শট।

লালমোহনবাবুর মাথা নাড়া দেখে বুঝলাম, তিনি রজতবাবুর কথাটার সমর্থনা করছেন।

সেটা কটা নাগাত?

আন্দাজ এগারোটা। আমি ঘড়ি দেখিনি। তার কিছু পরেই আমি মিঃ মজুমদারের কাজের ঘরে চলে আসি।

কাজের পর তো লাঞ্চ খেতেন আপনারা?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আপনারা তিনজনে এক সঙ্গে খেতেন?

হ্যাঁ।

খাওয়ার পর কী করেন?

লাঞ্চ শেষ হয় প্রায় একটার সময়। তারপর আমি নিজের ঘরে এসে কিছুক্ষণ বই পড়ি।

কী বই?

বই না, পত্রিকা। রিডারস ডাইজেস্ট।

তারপর?

তারপর দুটো নাগাত একটু ঝাউবনে ঘুরতে বেরেই। ঝাউবনটা খুব সুন্দর। আমি ফাঁক পেলেই ও দিকটা একবার ঘুরে আসি।

তারপর?

আড়াইটে নাগাত আমি ফিরে আসি। তারপর বিকেল চারটে অবধি বিশ্রাম করে আর একবার শুটিং দেখতে যাই। তখন মিঃ গাঙ্গুলীর একটা শট হচ্ছিল।

লালমোহনবাবু আবার মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

ফেলুদা বলল, মিঃ মজুমদার যখন পাঁচটার পরেও ঘর থেকে বেরোলেন না। তখন আপনার কোনও প্রতিক্রিয়া হয়নি?

আমি ঘড়ি দেখিনি! বাড়িতেহট্টগোল, জেনারেটর চলছে, আমার সময়ের খেয়াল ছিল না।

মিঃ মজুমদার বস হিসেবে কী রকম লোক ছিলেন।

খুব ভাল।

আপনার উপর চোটপাট করেননি কখনও?

না।

মাইনে যা পেতেন, তাতে আপনি খুশি ছিলেন?

হ্যাঁ।

খুনের আগের দিন লালমোহনবাবু দুপুরের দিকে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে মিঃ মজুমদারের গলা শুনতে পান। তিনি কাউকে বলছিলেন, ইউ আর এ লায়ার। আমি তোমার একটা কথাও বিশ্বাস করি না।–এই কথাটা উনি কাকে বলতে পারেন, সে ধারণা আছে আপনার?

একমাত্র ওঁর ছেলে ছাড়া আর কারুর কথা তো মনে পড়ছে না।

ওঁর ছেলের সঙ্গে মিঃ মজুমদারের সদ্ভাব ছিল না?

ছেলের সম্বন্ধে কতকগুলো ব্যাপারে ওঁর আক্ষেপ ছিল।

সেটা আপনি কী করে জানলেন?

আমার সামনে দু-একবার বলেছেন—সমুটা বড় রেকলেস হয়ে পড়ছে-ঝ ওই জাতীয় কথা। উনি ছেলেকে ভালও বাসতেন, আবার সেই সঙ্গে শাসনও করতেন।

উনি কোনও উইল করে গেছেন বলে আপনি জানেন?

যদ্দুর জানি করেননি।

কেন বলছেন এ কথা?

কারণ এক'দিন আমাকে বলেছিলেন—এখন তো দিব্যি আছি; আরেকটু শরীরটা ভাঙুক, তারপর উইল করব।

তার মানে ওঁর সম্পত্তি ওঁর ছেলেই পাচ্ছেন?

তই তো হয়ে থাকে।

এবার আপনার ঘরটা একবার দেখতে পারি কি?

আসুন।

রজতবাবুর শোবার ঘরে আসবাবপত্র খুবই কম। একটা খাট, একটা ছোট আলমারি, একটা তাক, একটা টেবিল আর একটা চেয়ার (দেয়ালে আলনা রয়েছে একটা, তাতে একটা শর্ট, একটা খয়েরি পুলোভার আর একটা তোয়ালে ঝুলছে। ঘরের একপাশে একটা সুটকেস রয়েছে, তাতে আর বি লেখা।

টেবিলের উপর তিন-চারখানা ইংরিজি পেপার ব্যাক আর গোটা পাঁচেক পত্রিকা রয়েছে।

হিন্দি পত্রিকা দেখছি যে? ফেলুদা প্রশ্ন করল।

আমার ছেলেবেলা কানপুরে কেটেছে, বললেন রজতবাবু, বাবা ওখানকার ডাক্তার ছিলেন। ইস্কুলে হিন্দি শিখেছিলাম। বাবা মারা যাবার পর কলকাতায় মামা বাড়িতে চলে আসি।

আমরা চারজন ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। ফেলুদা প্রশ্ন করল, মিঃ মজুমদার ঘুমের আগে একটা বড়ি খেতেন, সেটা আপনি জানতেন?

হ্যাঁ। আমি অনেকবার গিয়ে সে বড়ি এনে দিয়েছি। টফ্রানিল। পুরো মাসের স্টক একবারে কিনে নিতেন।

ই.এবার একটু সমীরণবাবুর সঙ্গে কথা বলব।

সমীরণবাবু স্নান সেরে তাঁর ঘরে বসে একটা খবরের কাগজ পড়ছিলেন। অশৌচ অবস্থা, তাই দাড়ি কামাননি ভদ্রলোক। ওঁর সঙ্গে কথা বলে খুব বেশি কিছু জানা গোল না। ভদ্রলোক স্বীকার করলেন যে ওঁর বাপের সঙ্গে মাঝে মাঝে কথা কাটাকাটি হত। বাবা আগে এ রকম ছিলেন না, বললেন ভদ্রলোক।অসুখের পর থেকে এ রকম হয়ে গিয়েছিলেন।

আপনার দিক থেকে কি কোনও পরিবর্তন হয়নি, যাতে আপনার বাবা আপনার উপর অসন্তুষ্ট হতে পারেন?

আমার দু-একটা ভুল স্পেকুলেশন হয়েছে সেটা ঠিকই, কিন্তু সে রকম তো ব্যবসায় হতেই পারে।

খুনের আগের দিন দুপুরে দেড়টা নাগাত আপনার সঙ্গে মিঃ মজুমদারের কোনও রকম কথা কাটাকাটি হয়েছিল?

কই, না তো!

আপনার বাবার কাছ থেকে কি আপনার মাঝে মাঝে টাকা চাইতে হত?

তা চাইব না কেন? আমার বাবা অনেক পয়সা করেছিলেন।

আপনার বাবা যে উইল করে যাননি, সেটা আপনি জানতেন?

জানতাম। বাবা একদিন আমাকে রাগ করে বলেছিলেন উইল করলে আমাকে এক পয়সাও দেবেন না।

কিন্তু এখন তো আপনি সব কিছুই পাচ্ছেন?

তা পাচ্ছি।

এতে আপনার অনেক সমস্যা মিটে যাবে–তাই না?

তা যাবে, কিন্তু এটার জন্য তো আমি দায়ী নই। আপনি কি ইঙ্গিত করছেন যে আমি বাবাকে খুন করেছি?

ধরুন যদি তাই করি। সুযোগ ও কারণ–দুটোই তো আপনার ছিল!

ঘুমের বড়ি খাওয়ানার সুযোগ আমার কী করে থাকবে? সে বড়ি তো দিত লোকনাথ।

কিন্তু সেদিন লোকনাথ দুধটা রেখে কিছুক্ষণের জন্য ঘর থেকে চলে গিয়েছিল, এটা ভুলবেন না। আর ছুরি বসানোর সুযোগও আপনার ছিল। আপনার বাবার ঘরেই এ কাজের জন্য একটি উত্তম অস্ত্র ছিল-যেটা সত্যি করেই ওই কাজে লাগানো হয়।

সমীরণবাবু একটা বাঁকা হাসি হেসে বললেন, এ সব কী বলছেন। আপনি? আমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? মূর্তি চুরির কথাটা ভাবছেন না কেন? বাবা মরলেই তা আমি টাকা পাব, সেখানে আর বালগোপালের দরকার কী?

আপনার হয়তো তাড়া ছিল। বাবার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তো আর আপনার হাতে টাকা আসবে না; তার তো একটা লিগ্যাল প্রোসেস আছে!

তা হলে লোকনাথ গেল কোথায়? যে আসল লোক, তার সম্বন্ধে তদন্ত না করে আপনি বৃথা সময় নষ্ট করছেন কেন?

সেটার কারণ আছে নিশ্চয়ই, যদিও সেটা প্রকাশ্য নয়।

ঠিক আছে, আপনি আপনার গোপন কারণ নিয়ে থাকুন, কিন্তু জেনে রাখুন যে, আমাকে এ ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে একেবারেই ঘটনাচক্রে। আসল অপরাধীকে পেতে হলে আপনার অন্য জায়গায় খুঁজতে হবে। এর বেশি আর আমি কিছু বলতে চাই না।

১০. দুপুরে লাঞ্চের পর

দুপুরে লাঞ্চের পর ফেলুদা বলল যে-থুপ ছবিটা ও মিঃ মজুমদারের স্টাডি থেকে এনেছে, সেটা নিয়ে ওকে একবার ফোটোগ্রাফির দোকান দাশ স্টুডিওতে যেতে হবে। তা ছাড়া, একবার থানায় গিয়ে সাহার সঙ্গে দেখা করাও দরকার; কতকগুলো জরুরি ইনফরমেশন চাই, সে কাজটা আমার চেয়ে পুলিশের পক্ষে অনেক বেশি সহজ। তোরা এই ফাঁকে কোথাও ঘুরে আসতে চাস তো আসতে পারিস। আমি বাড়ি ফিরে আর বেরোবি না। কারণ আমার অনেক কিছু চিন্তা করার আছে। কেসটা এখনও ঠিক দানা বাঁধেনি।

ফেলুদা বেরিয়ে গেল। কী আর করি—আমরাও দুজনে বেরিয়ে পড়লাম। বাইরে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, হাঁটতে কোনও অসুবিধা নেই।

হোটেলের বাইরে এসে আমি লালমোহনবাবুকে বললাম, আপনার একটা জিনিস এখনও দেখা হয়নি; সেটা আমি দেখেছি। সেটা হল মজুমদারের বাড়ির পিছনের ঝাউবন। অবিশ্যি আমিও গেছি। মাত্র দু মিনিটের জন্য, কিন্তু তাতেই মনে হয়েছ বনটা দারুণ। যাবেন?

সেটা যেতে হলে মজুমদারের বাড়ির ভিতর দিয়ে যেতে হয়?

আমি বললাম, তা কেন? ওদের বাড়িতে পৌঁছবার আগেই মেন রোড থেকে একটা রাস্তা বাঁ দিকে বেরিয়ে বনের দিকে চলে গেছে।–দেখেননি?

আমরা দুজন রওনা দিয়ে দিলাম। ফেলুদার কথাটা মন থেকে দূর করতে পারছি না। ও যে কয়েকটা ক্লু পেয়েছে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেগুলো যে কী সেটা এখন আমাদের বলবে না। ওর হালচাল আমার খুব ভাল করেই জানা আছে। এখন ওর চিন্তা করা আর ইনফরমেশন জোগাড় করার সময়। সব সূত্র খুঁজে পেয়ে কেসটা মাথায় পরিষ্কার হলে। তারপর বম্বশেলটা ছাড়বে।

পথে যেতে যেতে লালমোহনবাবু বললেন, এখানে যে রহস্যটা কোথায়, সেটা আমার কাছে ক্লিয়ার হচ্ছে না, তপেশ। লোকনাথ বেয়ারা খুন করে মূর্তি চুরি করে পালিয়েছে – ব্যস, ফুরিয়ে গেল! তোমার দাদা এত যে কী সাতপাঁচ ভাবছেন; বাকিটা তো পুলিশের ব্যাপার। তারা কালপ্রিটকে খুঁজে পেলেই খেল খতম।

আমি বললাম, আপনি ফেলুদাকে এত দিন চেনেন, আর এটুকু বুঝছেন না যে, কোথাও একটা গণ্ডগোল না থাকলে ফেলুদা মিথ্যে ভাৰত না! এক তো চোখের সামনে দেখতে পেলেন যে, ওঁকে মেরে ফেলার চেষ্টা হল খাদে ফেলে। সেটা নিশ্চয়ই লোকনাথ বেয়ারা করেনি। তা ছাড়া, মিঃ মজুমদারের জীবনে একটা কেলেঙ্কারি রয়েছে। উনি নিজে একজনকে অজান্তে খুন করেছিলেন। তারপর তাঁর ব্যাঙ্ক থেকে একজন টাকা চুরি করে পালিয়েছিল। তাকে ধরা যায়নি। তারপর আপনি নিজে সে দিন শুনলেন মজুমদার একজনকে ধমক দিচ্ছেন, সেটা যে কে সেটা এখনও বোঝা যায়নি। এত রকম জিলিপির প্যাঁচ সত্ত্বেও আপনি বলছেন, কেসটা সহজ?

সত্যি বলতে কী, আমার নিজের মনের মধ্যে সব কিছু এমন তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিল যে আমি কোনওটার সঙ্গে কোনওটার যোগ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। কাজেই মনে মনে ঠিক করেছিলাম যে, ভাবার কাজটা ফেলুদার উপরেই ছেড়ে দেব!

ঝাউবনটাতে একবার ঢুকেই বুঝেছিলাম যে সেটা একটা আশ্চর্য জায়গা। আজ ভাল করে দেখে আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। এটাকে ঝাউবন বলা ঠিক নয়, কারণ এখানে ফাইন, ফার, রডোডেনড্রপ ইত্যাদি অনেক রকম চেনা-অচেনা গাছই আছে। গাছের মাঝে মাঝে ঝোপ রয়েছে, তাতে আবার লাল নীল হলদে ফুল। আজ দিনটা মেঘলা, তাই সমস্ত বনটাই আবছা অন্ধকারে ঢাকা। মনে হয়, অজস্র থামওয়ালা একটা বিরাট গির্জার মধ্যে আমরা এসেছি। যেখান দিয়ে এখন হেঁটে চলেছি। সেখান থেকে পশ্চিমে চাইলে গাছের ফাঁক দিয়ে নয়নপুর ভিলা দেখা যায়। অবিশ্যি বনের মধ্যে দিয়ে যতই এগোচ্ছি ততই বাড়িটা দূরে সরে গিয়ে গাছপালায় ঢেকে যাচ্ছে। এটা মানতেই হবে যে, এই নিস্তব্ধ

দুপুরে এই ঘন বনের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে গা-টা বেশ ছমছম করছিল। লালমোহনবাবু তাই বোধহয় একবার বললেন, এখানে কাউকে খুন করলে লাশ আবিষ্কার করতে মাসখানেক অন্তত লাগবে।

আমরা আরও এগিয়ে চললাম। এবার আর নয়নপুর ভিলা দেখা যাচ্ছে না। একটা মাত্র পাখির ডাক কিছুক্ষণ থেকে কানে আসছে, কিন্তু সেটা যে কী পাখি তা জানি না।

উত্তর দিকে চোখ পড়াতে হঠাৎ দেখি মেঘ সরে গিয়ে দুটো পাইন গাছের মধ্যে দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছে। আমি লালমোহনবাবুকে সেই দিকে দেখতে বলব বলে ডাইনে ঘুরেই দেখি ভদ্রলোক চোখ বড়-বড় করে থমকে দাঁড়িয়ে গেছেন। কী দেখছেন ভদ্রলোক?

ওঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে পুবে চাইতেই বুঝলাম ব্যাপারটা কী।

একটা গাছের গুড়ির পাশে একটা ঝোপ, আর সেই ঝোপের পিছনে এক জোড়া জুতো-পরা পা দেখা যাচ্ছে।

এগিয়ে গিয়ে দেখবে? ফিসফিসে গলায় জিজ্ঞেস করলেন লালমোহনবাবু।

আমি এ প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়ে এগিয়ে গেলাম। ওই জুতা জোড়া আমি আগে দেখেছি।

ঝোপটা পেরোতেই ব্যাপারটা বুঝলাম।

একটা লাশ পড়ে আছে মাটিতে।

একে আমরা চিনি।

এ হল লোকনাথ বেয়ারা।

একেও বুকে ছুরি মেরে খুন করা হয়েছে, যদিও অস্ত্রটা কাছাকাছির মধ্যে নেই।

তার বদলে আছে একটা পাথরের সামনে একটা ভাঙা বাতল, আর সেই বাতলের চারিদিকে ছড়ানো গোটা ত্রিশোক বড়ি। সেই বাড়ি এককালে সাদা ছিল, কিন্তু এখন জল আর মাটি লেগে সেটা আর সাদা নেই।

আমরা আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে সোজা ফিরে এলাম হোটেলে। ফেলুদাও বলল সে ফিরেছে মিনিট পাঁচেক আগে। লালমোহনবাবু সেনসেশনাল ব্যাপার– বলে নাটক করতে আরম্ভ করেছিলেন। আমি ওঁকে থামিয়ে এক কথায় ব্যাপারটা বলে দিলাম।

ফেলুদা তৎক্ষণাৎ থানায় ফোন করে দিল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সাহাকে নিয়ে দুটো জিপ চলে এল, একটায় চারজন কনস্টেবল।

আমরা আবার ফিরে গেলাম ঝাউবনে যেখানে লাশ পাওয়া গিয়েছিল, সেই জায়গায়।

ইনিও দেখছি ছুরিকাঘাতে মৃত্যু, বললেন সাহা।আসলে আমরা খুঁজছিলাম লোকালয়ে, ভাবছিলাম লোকটা কোনও গোপন ডেরায় লুকিয়ে রয়েছে। এই ডিসকভারির জন্য পুরো ক্রেডিট পাবেন মিস্টার মিত্তিরের বন্ধু এবং কাজিন! সত্যিই আপনারা কাজের কাজ করেছেন।

মৃতদেহ চলে গেল পুলিশের জিন্মায়, আমরা ফিরে এলাম হোটেলে।

এ যে মোড় ঘুরে গেল! আমাদের ঘরে এসে খাটের উপর ধাপ্ত করে বসে বললেন লালমোহনবাবু!

ঘুরেছে ঠিকই, বলল ফেলুদা, কিন্তু অন্ধকারের দিকে নয়, আলোর দিকে। এখন শুধু কয়েকটা খবরের অপেক্ষা। তারপর চূড়ান্ত নিষ্পত্তি।

সন্ধ্যায় এল ফেলুদার টেলিফোন-সাহার কাছ থেকে। একপেশে কথা শুনে, আর ফেলদুর গোটা বিশেক হ্যাঁ, আই সি আর ভেরি গুড) শুনে আন্দাজ করলাম যে, খবরটা যা আসবার তা এসে গেছে। শেষে ফেলুদা বলল, তা হলে কাল সকাল দশটার সময় সকলকে বলুন যেন মিঃ মজুমদারের বৈঠকখানায় জমায়েত হয়। নয়নপুর ভিলার সকলে এবং মাউন্ট এভারেস্টের পুলক ঘোষাল, রাজেন রায়না, মহাদেব ভার্মা আর ক্যামেরাম্যান সুদেব ঘোষ। আপনাদের উপস্থিতি তো অবশ্যই এসেনশিয়াল।

১১. এশিয়ার্জ বিজিয়েস্ট সিনেমা ডাইরেক্টর

পরদিন সকাল সাতটায় আমাদের হোটেলের ঘরের ফোনটা বেজে উঠল। আমরা দুজনেই আগেই উঠে পড়েছিলাম, সবে বেড-টি খাওয়া হয়েছে, ফেলুদা বিছানায় বসেই হাত বাড়িয়ে ফোনটা তুলল। ওকে শুধু দুটো কথা বলতে শুনলাম—বলেন কী! আর আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে নিচ্ছি।

ফোনটা রেখে আমার দিকে ফিরে বলল, লালমোহনবাবুকে বল তৈরি হয়ে নিতে—এক্ষুনি!

কী ব্যাপার, কোথায় যাওয়া হচ্ছে? সেটা পুলিশের জিপে উঠে বুঝলাম। আজ সক্কাল সক্কাল পুলিশের জিপ নয়নপুর ভিলায় গিয়েছিল ওদের মিটিং সম্বন্ধে খবর দিতে। গিয়ে শুনল সমীরণবাবু নাকি একটা জরুরি টেলিফোন পেয়ে পনের মিনিট আগে শিলিগুড়ি রওনা হয়ে গেছেন। অথচ ফেলুদার মতে মিটিং-এ তাঁকে ছাড়া চলবে না।

পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে এই স্পিডে কোনও দিন চলেছি বলে মনে পড়ে না। দেখতে দেখতে ঘুম সোনাদা টুং ছড়িয়ে গেল। তবু ভাগ্যি ভাল এখন অবধি তেমন কুয়াশা পাইনি। নইলে জিপের স্পিড তোলা যেত না। অসম্ভব তুখোড় ড্রাইভার, তাই পঁয়তাল্লিশ মিনিটের রাস্তা আধা ঘণ্টায় পেরিয়ে গেল।

সাহা অবিশ্যি কার্সিয়ং আর শিলিগুড়িতেও খবর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন যাতে সমীরণবাবুর গাড়ি তারা আটকায়। কিন্তু ট্যাক্সির নম্বরটা দেওয়া সম্ভব হয়নি। সেটা বার করতে বেশ কিছুটা সময় নষ্ট হয়ে যেত।

কার্সিয়ং পর্যন্ত গিয়েও সমীরণবাবুর ট্যাক্সির কোনও পাত্তা পাওয়া গেল না। সাহা ড্রাইভারকে বললেন, এবার পাংখাবাড়ির শর্টকাটটা ধরো।

আমাদের দুটো জিপ ছিল; একটা সাধারণ রাস্তা দিয়ে গেল, আর অন্যটা—যাতে আমরা □ য়ছি—সেটা শর্টকাটটা ধরল।

পাংখাবাড়ির রাস্তা যে কী ভয়ানক প্যাঁচালো, সেটা যে না দেখেছে তাকে বোঝানো অসম্ভব। লালমোহনবাবু তো চোখ বন্ধ করে রইলেন। বললেন, অন্য গাড়ির দেখা পেলে বোলো, তপেশ। আমি তার আগে আর চোখ খুলছি না; খুললেই গা গুলোবে।

পনের মিনিট সাপের মতো প্যাঁচানো উতরাই দিয়ে যাবার পর একটা হেয়ারপিন বেন্ড ঘুরেই দেখা গেল একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তার প্রায় মাঝামাঝি। বাঝাই যাচ্ছে টায়ার পাংচার। গাড়ির পাশে রাস্তায় দাঁড়িয়ে অসহিষ্ণুভাবে সিগারেট টানছেন সমীরণ মজুমদার।

আমাদের জিপ দেখেই ভদ্রলোক কেমন যেন হকচাকিয়ে তটস্থ হয়ে পড়লেন।

আমরা সকলেই গাড়ি থেকে নামলাম। ফেলুদা আর সাহা এগিয়ে গেল সমীরণবাবুর দিকে। ভদ্রলোকের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

কী— কী ব্যাপার?

কিছুই না, বলল ফেলুদা, হয়েছে কী, আপনি যে মিটিংটা অ্যাটেন্ড করতে যাচ্ছেন কলকাতা, তার চেয়েও ঢের জরুরি মিটিং রয়েছে আজই, সকাল দশটায় আপনাদের নয়নপুর ভিলাতে। সেখানে আপনার থাকা একান্তই প্রয়োজন। অতএব আর বাক্যব্যয় না করে আপনার ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে উঠে পড়ুন আমাদের জিপে। সঙ্গে আপনার সুটকেসটাও অবিশ্যি নেওয়া চাই।

তিন মিনিটের মধ্যে আমরা আবার রওনা হলাম। উলটা মুখে। পথে কোনও কথা হল না। ফেলুদা চুপ, সাহা চুপ, সমীরণবাবুও চুপ।

নয়নপুর ভিলা যখন পৌঁছলাম তখন পৌনে দশটা।

বাড়ির ভিতর ঢুকে ফেলুদা সমীরণবাবুকে বলল, আপনার লোকনাথ বেয়ারা যখন আর নেই, তখন আপনার অন্য চাকর বাহাদুরকে বলুন কফি করতে। অন্তত কারো কাপ।

আমরা বৈঠকখানায় গিয়ে বসলাম। পাশের ঘর থেকে আরও চেয়ার এনে রাখা হয়েছে। সবাই যাতে বসতে পারে।

কফি আসার সঙ্গে সঙ্গেই এভারেস্ট হোটেলের দলও চলে এল। পুলক ঘোষাল, একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করল, ব্যাপার কী লালুদা?

লালমোহনবাবু বললেন, তুমি যেই তিমিরে, আমিও সেই তিমিরে। তবে যতদূর জানি, রহস্যে আলোকপাতের জন্যেই এই মিটিং-এর ব্যবস্থা। আলোকসম্পাত করবেন। শ্রীপ্রদোষ মিত্র।

আমাদের শুটিং আবার চালু করতে পারব তো?

সে তো ভাই বলতে পারব না। কিছুক্ষণের মধ্যেই জানতে পারবে।

দুগ্‌গা দুগ্‌গা!...বারো বছর এ লাইনে আছি, সতেরোখানা ছবি ডাইরেক্ট করেছি, কিন্তু এ হুজতে পড়িনি কখনও।

পুলক ঘোষীলের কচুমাচু ভাব দেখে আমার মায়া হল। ছাপ্পান্ন লাখ খরচ হবার কথা ছবিটাতে। সেটা এখন বেড়ে গিয়ে কোথায় দাঁড়াবে কে জানে?

সবাই চেয়ার বেছে নিয়ে বসে পড়ল। সকলেরই অস্বস্তি ভাব। আমি একবার সকলের উপর চোখ বুলিয়ে নিলাম। আমার ডাইনে বসেছেন। লালমোহনবাবু, আর বাঁয়ে ফেলুদা। ফেলুদার পরে পর-পর গোল হয়ে বসেছেন ইনস্পেক্টর সাহা, সমীরণবাবু, রজতবাবু, পুলক ঘোষাল, মহাদেব ভার্মা, রাজেন্দ্র রায়না। আর ক্যামেরাম্যান সুদেব ঘোষ। এ ছাড়া

ঘরে দাঁড়িয়ে আছে নেপালি চাকর বাহাদুর, রান্নার লোক জগদীশ, আর চারজন কনস্টেবল। চারজনই রয়েছেন ঘরের দরজার মুখটাতে।

আমাদের কফি খাওয়া শেষ হল। শেলফে রাখা একটা বাহারের ঘড়িতে টিং টিং করে দশটা বাজল। আর তার সঙ্গে সঙ্গেই ফেলুদা উঠে দাঁড়াল। সমস্ত ঘরে একমাত্র ফেলুদার মধ্যেই কোনও অস্বস্তির ভাব নেই। ইনস্পেক্টর সাহাকেও একবার আঙুল মটকাতে লক্ষ করেছি।

বোম্বাইয়ের অভিনেতা দুজন রয়েছে বলে ফেলুদা ইংরিজিতে কথা বলল, আমি সেটা বাংলা করে লিখছি।

ফেলুদা আরম্ভ করল–

গত ক'দিনে এ বাড়িতে কয়েকটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। সাধারণ অবস্থায় হয়তো ঠিক এইভাবে এগুলো ঘটত না, কিন্তু এ বাড়িতে একটা ফিল্মের শুটিং চলাতে দৈনন্দিন রুটিনে কিছু পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল, এবং অনেক লোকের মনই পড়ে ছিল এই শুটিং-এর দিকে-যার ফলে কতকগুলি ঘটনা ঘটা সম্ভব হয়েছিল।

প্রধান ঘটনা হল-বাড়ির যিনি কর্তা-বিরূপাক্ষ মজুমদার-তিনি খুন হন। আমি নিজে একজন প্রাইভেট ইনভেসটিগেটার; আমার কাছে হত্যাটা খুব রহস্যজনক বলে মনে হচ্ছিল। খুনের প্রধান উদ্দেশ্য যদি মূল্যবান জিনিস চুরি হয়ে থাকে, তা হলে লোকনাথ বেয়ারার উপর সন্দেহ পড়াটা খুব স্বাভাবিক, কারণ সে খুনের পর থেকেই উধাও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমার মন এটা মানতে চাইছিল না-কেন, সেটা ক্রমে প্রকাশ করছি। প্রথমে, যিনি খুন হয়েছিলেন তাঁকে জড়িয়ে দুটো ঘটনা আমি আপনাদের বলতে চাই।

একটা ঘটে যখন তিনি কলকাতায় বেঙ্গল ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন। ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের একটি তরুণ কর্মচারী-নাম ভি, বাল্যাপোরিয়া-তহবিল

তছরূপ করে প্রায় দেড় লাখ টাকা হাত করে বেপাত্তা হয়ে যায়। আজ পর্যন্ত তার কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি।

দ্বিতীয় ঘটনা ঘটে মধ্যপ্রদেশের নীলকণ্ঠপুরে। ওখানকার রাজা পৃথ্বী সিং-এর আমন্ত্রিত হয়ে বিরূপাক্ষ মজুমদার সেখানে যান বাঘ শিকার করতে। সেখানে জঙ্গলে ঝোপের পিছনে বাঘ ভেবে তিনি একটি মানুষের উপর গুলি চালান। তার ফলে সেই মানুষের মৃত্যু হয়। যিনি মরেন তিনি ছিলেন বাঙালি। নাম সুধীর ব্রহ্ম। নীলকণ্ঠপুর রাজ কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর একটি শখ ছিল, সেটা হল কবিরাজি গাছ-গাছড়া সংগ্রহ করা। এই কাজ করতেই তিনি জঙ্গলে গিয়েছিলেন, এবং এই জন্যই তাঁর মৃত্যু হয়। এই হত্যার খবর যাতে সম্পূর্ণ গোপন থাকে, তার জন্য পৃথ্বী সিংকে অনেক টাকা খরচ করতে হয়।

যিনি মারা গিয়েছিলেন, সেই সুধীর ব্রহ্মের একটি ছেলে ছিল, নাম রমেন ব্রহ্ম। স্বভাবতই রমেন ব্রহ্ম এই ঘটনায় খুবই বিচলিত হয়ে পড়েন। তখন তাঁর বয়স ছিল ষোল। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, বড় হয়ে তিনি এই অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবেন। এখানে বলে। রাখি, এই ঘটনা আমি শুনি দার্জিলিং-এর বাসিন্দা এবং মিঃ মজুমদারের প্রতিবেশী হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের কাছে, যিনি সেই সময় নীলকণ্ঠপুরে থাকতেন এবং সুধীর ব্রহ্মের পরিবারকে চিনতেন। এই ঘটনার অবিশ্যি কোনও প্রমাণ নেই, কিন্তু তাঁর জীবনে যে একটা কলঙ্কময় ঘটনা ঘটেছিল এবং সেটা যে খবরের কাগজ থেকে চেপে রাখা হয়েছিল সে ইঙ্গিত বিরূপাক্ষ মজুমদার নিজেই আমাকে দিয়েছিলেন। সুতরাং এটা অবিশ্বাস করার কোনও কারণ আমি দেখি না।

এবার বিরূপাক্ষবাবুর হত্যার ঘটনায় আসা যাক। তাঁকে মারবার কারণ ও সুযোগ কর থাকতে পারে এটা ভাবতে গেলে প্রথমেই মনে হয় তাঁর ছেলে সমীরণবাবুর কথা। সমীরণবাবু শেয়ার মার্কেটে অনেক লোকসান দিয়েছেন এ খবর আমরা পেয়েছি। এটা কি সমীরণবাবু অস্বীকার করতে পারেন?

সমীরণবাবু মাথা নেড়ে না বললেন, তাঁর দৃষ্টি মেঝের কার্পেটের দিকে!

আর তিনি যে তাঁর পিতার মৃত্যুতে আর্থিক দিক দিয়ে বিশেষ লাভবান হলেন সেটা কি তিনি অস্বীকার করতে পারেন?

সমীরণবাবু এবারও মাথা নেড়ে না বললেন।

ভেরি গুড, বলল ফেলুদা। এবার আমরা খুনের চেহারাটা দেখব।

বিরূপাক্ষবাবু দুধে মিশিয়ে টক্রানিল বলে একটা বড়ি খেয়ে দুপুরে ঘুমোতেন। এই দুধ তাঁকে এনে দিত তাঁর বেয়ারা লোকনাথ। এই বড়ি মৃত্যুর দু দিন আগে পুরো এক মাসের স্টক, অর্থাৎ একত্রিশটা, কেনেন বিরূপাক্ষবাবু; তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। খুনের পর দেখা যায় যে তার একটিও অবশিষ্ট নেই। আমাদের স্বভাবতই মনে হবে যে এই বড়িগুলির সবই তাঁর দুধের সঙ্গে মেশানো হয়েছিল। ত্রিশটা টাফ্লানিল একসঙ্গে খেলে একজন মানুষের মৃত্যু হতে পারে। আমাদের ধারণা আরও বদ্ধমূল হয় এই দেখে যে, বিরূপাক্ষবাবু একটা কাগজে কাঁপা হাতে বিষ কথাটা লিখে রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে আরেকটা ব্যাপার দেখা গেল। এই যে, তাঁকে যে শুধু বড়ি খাওয়ানো হয়েছিল তা নয়। সেই সঙ্গে তাঁকে ছোরাও মারা হয়েছিল। এটা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, বিষ কথাটা লেখার পরে তাঁকে ছোরা মারা হয়েছিল। মনে হয়, বড়িতে কাজ দেবে না মনে করে আততায়ী পরে আরেকবার এসে ছোরা মেরে খুনকে আরও নিশ্চিন্তভাবে সম্পন্ন করে।

এখানে প্রশ্ন আসে—এই খুনের মোটিভ কী? এরও উত্তর পেতে কোনও অসুবিধা হয়নি। বিরূপাক্ষবাবুর ঘরে অষ্টধাতুর একটি মহামূল্য মূর্তি ছিল। সেটি এই খুনের সঙ্গে সঙ্গে উধাও হয়ে যায়।

এখানে আমার মনে খটকা যাই থাকুক না কেন, পুলিশের বিশ্বাস হয় যে বেয়ারা লোকনাথ মূর্তিটা হাত করার জন্য মনিবকে ত্রিশটা বড়ি খাইয়ে তারপর খুনটাকে আরও জোরদার করার জন্য তাঁর বুকে ছুরি মেরে মূর্তিটাকে নিয়ে পালায়। গতকাল কিন্তু জানা যায় যে এ

ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আমার বন্ধু মিঃ গাঙ্গুলী ও ভাই তপেশ গতকাল বিকেলে এই বাড়ির পিছনের ঝাউবনে বেড়াতে গিয়ে অকস্মাৎ লোকনাথ বেয়ারার মৃতদেহ আবিষ্কার করে। তাকেও ছুরি মেরে খুন করা হয়েছে। শুধু তাই নয়; মৃতদেহের পাশে ছড়ানো ছিল খান ত্রিশোক টিফানিলের বড়ি। অথাৎ লোকনাথ শুধু যে খুন, বা চুরি করেনি তা নয়, যাতে তার মনিবকে বড়ি খাইয়ে হত্যা না করা হয়, সেইজন্য সে বড়িগুলো নিয়ে পালাচ্ছিল। সেই সময় কেউ তাকে খুন করে।

অর্থাৎ এও জানা যাচ্ছে যে বিরূপক্ষ মজুমদারের মৃত্যু হয় একমাত্র ছুরির আঘাতেই, বড়ি খেয়ে নয়।

ইতিমধ্যে আমার নিজের কতকগুলো অভিজ্ঞতা হয় যে-সম্বন্ধে আমি আপনাদের বলতে চাই।

নিয়নপুর ভিলার একজন বাসিন্দা হিসাবে রজত বাস সম্বন্ধে আমার একটা কৌতুহল ছিল, যদিও প্রথম দিকে তাঁর উপর সন্দেহ পড়ার কোনও কারণ ছিল না। তাঁকে জেরা করে আমি জানতে পাই যে, তিনি ফিফটি সেভানে বি কম পাশ করেন।

এ ব্যাপারে আমরা অনুসন্ধান করে জেনেছি যে, রজত বোস নামে কোনও ছাত্র ওই বছর বি কম পাশ করেনি।

আমি রজতবাবুর দিকে চাইলাম। তিনি হঠাৎ যেন কেমন মুষড়ে পড়েছেন। ফেলুদার দৃষ্টি তখন রজতবাবুর দিকে। সে বলল, এই গোলমালটা কেন হল বলতে পারেন?

রজতবাবু দুবার গলা খাকরে চুপ করে গেলেন। তারপর যেন নিজের মনকে শক্ত করে একটা বড় রকম নিশ্বাস টেনে নিয়ে বললেন, আমি বিরূপাক্ষ মজুমদারকে খুন করিনি, কিন্তু করতে চেয়েছিলাম-একশোবার চেয়েছিলাম। হি কিলড মাই ফাদার। তারপর ঘুষ দিয়ে লোকের মুখ বন্ধ করেন। হি ওয়াজ এ ক্রিমিন্যাল!

ফেলুদা বলল, সে ব্যাপারে আপনার উপর আমার সহানুভূতি আছে। কিন্তু এবার আমি আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই--সত্যি কি মিথ্যে বলুন।

কী কথা?

রজতবাবু এখনও হাঁপাচ্ছেন।

ফেলুদা বলল, সে দিন লোকনাথ রোজকার মতো দুধে বড়ি মিশিয়ে তার মনিবকে খবর দিতে গিয়েছিল। মজুমদার সেই সময় শুটিং দেখছিলেন। তখন দুধের গেলাস আর বড়ির বোতল খাবার ঘরে পড়ে ছিল। আপনি সুযোগ বুঝে দুধে আরও বেশি করে বড়ি মেশাতে গিয়েছিলেন-তাই নয় কি?

রজতবাবু বললেন, আমি তো বলেইছি—আমি আমার বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলাম।

কিন্তু আপনি কাজটা করার আগেই ঘরে লোকনাথ ফিরে আসে-ঠিক কি না? এবং সে আপনাকে ওখানে ওইভাবে দেখে সমস্ত ব্যাপারটা আঁচ করে। আপনি তার মুখ বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর হন।

হি ওয়াজ এ ফুল! কেঁচিয়ে উঠলেন রজতবাবু। আমি ওকে দলে টানতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ও রাজি হয়নি।

তাই আপনি তাকে আক্রমণ করেন। সে আপনার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে বড়ি সমেত বোতল নিয়ে ঝাউবনে পালায়। আপনি তার পিছু নেন; আপনার সঙ্গে অস্ত্র ছিল—মিঃ জুমদারের পেপার কাটার। আপনি তাকে ধরে ফেলেন, কিন্তু আপনি ছুরি মারার আগে সে তার হাতের বোতল মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

এতক্ষণ দৃঢ়ভাবে থাকলেও রজতবাবু হঠাৎ ভেঙে পড়ে দু হাতে মুখ গুঁজে নিলেন।

দুজন কনস্টেবল তাঁর দিকে এগিয়ে গেল।

আর একটা ছোট্ট প্রশ্ন, কলাল ফেলুদা, আপনার সুটকেসে যে আর বি লেখা আছে, সেটা তো আসলে রমেন ব্রহ্ম, এবং সেই জন্যেই পরে রাজত বোস নাম নিয়েছিলেন?

রজতবাবু মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন।

ফেলুদা আবার তার কথা শুরু করল।

এর মধ্যে গতকাল আবার একটা ঘটনা ঘটে। একজন লোক কুয়াশার মধ্যে আমাকে খাদে ফেলে মারতে চেষ্টা করে।

সমস্ত ঘর চুপ। সকলেই ফেলুদার দিকে চেয়ে আছে। ফেলুদা বলে চলল–

লোকটিকে ভাল করে দেখা যায়নি কুয়াশার জন্য, তবে তার চাপ দাড়িটা যে কৃত্রিম, সেটা সন্দেহ করেছিলাম। সে লোকটি যখন আমাকে ঠেলা মারে তখন আমি একটা সেন্টের গন্ধ পাই। সেটা ছিল। ইয়ার্ডলি ল্যাভেন্ডার এবং সে গন্ধ আমি আরেকবার একজনের গায়ে পেয়েছিলাম।–দমদম এয়ারপোর্টে রেস্টোরান্টে বসে।

এখানে হঠাৎ রাজেন রায়ন কথা বলে উঠল।

আমি নিজে ইয়ার্ডলি ল্যাভেন্ডার ব্যবহার করি, কিন্তু মিস্টার মিত্তির যদি বলেন যে আমি ছাড়া সে সেন্ট কেউ ব্যবহার করে না, তা হলে তিনি অত্যন্ত ভুল করবেন।

ফেলুদার ঠোঁটের কোণে হাসি।

আপনি যে এ কথা বলবেন তা আমি জানতাম, বলল ফেলুদা। কিন্তু আমার কথা বলা তো এখনও শেষ হয়নি, মিঃ রায়না।

বলুন কী বলবেন।

ফেলুদা এবার সাহার কাছ থেকে একটা পোর্টফোলিও নিয়ে তার ভিতর থেকে একটা খাম বার করল। আর সেই সঙ্গে একটা বাঁধানো ছবি। এটা সেই বেঙ্গল ব্যাঙ্কের গ্রুপ ফোটো।

এই গ্রুপ ছবিটার কথা কি আপনার মনে আছে, মিঃ রায়না?

আই হ্যাভ নেভার সিন ইট বিফোর।

কিন্তু এতে যে আপনি নিজে উপস্থিত রয়েছেন।

মানে?

এইবার ফেলুদা খাম থেকে একটা ছবি বার করল। এটা একটা মুখের এনলার্জমেন্ট।

এই ছবিটার উপর আমার একটু কলম চালাতে হয়েছে, বলল ফেলুদা, কারণ তখন আপনার দাড়ি ছিল না, এখন হয়েছে। দেখুন তো এঁকে চিনতে পারেন কিনা। এটা বেঙ্গল ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের ভি. বাল্যাপেরিয়ার ছবি।

রায়না আর হাতে নিয়ে ছবিটা দেখল না। সে একটা রুমাল বার করে ঘাম মুছছে। আমি দেখতে পাচ্ছি। ছবিটার সঙ্গে রায়নার হুবহু সাদৃশ্য।

যাঁর বাড়িতে আপনার শুটিং হবে তিনি যে আপনার এককালের বস, এবং তিনি যে আপনাকে চিনে ফেলবেন এটা আপনি কী করে জানবেন? আর, একবার যদি সত্য কথা প্রকাশ পেয়ে যায় তা হলে সেই কলঙ্কের চাপে আপনার ফিল্ম কেরিয়ারের কী দশা হবে সেটা তো। আপনি বুঝতেই পারছিলেন। মিঃ মজুমদার আপনাকে জানিয়েছিলেন যে তিনি আপনাকে চিনতে পেরেছিলেন। আপনি অস্বীকার করেন। তাতে তিনি বলেন, ইউ আর এ লায়ার! আর তারপর বাংলায় বলেন, আমি তোমার একটা কথাও বিশ্বাস করি না। আপনি এগারো বছর বেঙ্গল ব্যাঙ্কে চাকরি করেন, কাজেই আপনি বাংলা যথেষ্ট ভাল ভাবেই জানতেন।

আর খুনের সুযোগের কথাই যদি হয়, তা হলো লাঞ্চের সময় পঁয়তাল্লিশ মিনিট কাজ বন্ধ ছিল; সেই ফাঁকে মিঃ মজুমদারের ঘরে যাওয়া আপনার সম্ভব ছিল; আর মিঃ মজুমদার যখন আপনাদের তাঁর বালগোপালকে দেখাতে নিয়ে যান, তখন তার পাশেই যে একটি ভুজালি রয়েছে সেটা নিশ্চয়ই আপনার দৃষ্টি এড়ায়নি।

সাহা এবার রায়নার দিকে রওনা দিলেন। পুলক ঘোষাল মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন। তাঁর মনের কী অবস্থা সেটা আমি বেশ বুঝতে পারছি। লালমোহনবাবু এবার আমার দিকে ঝুকে পড়ে ফিসফিস করে বললেন, কিন্তু মজুমদার বিষ কথাটা কেন লিখলেন–

লালমোহনবাবুর কথা শেষ হল না, কারণ ফেলুদা আবার মুখ খুলেছে। সে বলল–

আমি আরও বলছি, মিঃ রায়না। মিঃ মজুমদারকে যখন আপনি খুন করতে যান, তখন তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। তিনি আপনাকে দেখেছিলেন। ছুরির আঘাতের পরও তিনি কয়েক মুহূর্ত বেঁচে ছিলেন। কারণ ছুরি ঠিক, মোক্ষম জায়গায় লাগেনি। মিঃ মজুমদার আপনার নামটা লিখে যেতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পুরোটা লিখতে পারেননি। সে নামটা কী আপনি বলবেন?–রায়না চুপ।

আমি বলি?

রায়না চুপ।

আমরা খবর নিয়ে জেনেছি যে, ভি বাল্যাপোরিয়া হচ্ছে বিষ্ণুদাস বাল্যাপেরিয়া। বিষ্ণুদাসের বিষ-টুকু মজুমদার লিখতে পেরেছিলেন, আর পারেননি।

আই অ্যাম সরি, আই অ্যাম সরি! বলে ডুকরে কেঁদে উঠলেন বিষ্ণুদাস বাল্যাপেরিয়া ওরফে রাজেন রায়না।

ফেলুদা এবার সমীরণবাবুর দিকে চাইল। সমীরণবাবু বললেন, আমি তো এদের কাছে শিশু!

তা বটে, বলল ফেলুদা।এবার সুটকেসটা খুলুন তো দেখি; খুলে অষ্টধাতুর বালগোপালটা বার করে দিন।

বিকেলে কেভেনটারসের ছাতে বসে কথা হচ্ছিল। আমরা তিনজন আর পুলক ঘোষাল।

দার্জিলিংটা বড় অপয়া জায়গা, লালুদা, বললেন পুলক ঘোষাল। তার চেয়ে ভাবছি, সিমলায় করব শুটিং-টা। রাজেন রায়নার জায়গায় অর্জুন মেরহাত্রা। কেমন মানাবে?

দুর্দান্ত, বললেন লালমোহনবাবু। তবে আমার অংশটা বাদ পড়বে না তো!

পাগল!—নভেম্বরেই শুটিং আরম্ভ করে ফেলব, আর ফেব্রুয়ারিতে শেষ। আরও চারখানা ছবি আছে আমার হাতে, সব এইটি সেভেনের মধ্যে নামিয়ে দিতে হবে।

চারখানা ছবি! পর পার?

তা আপনাদের আশীর্বাদে মোটামুটি চলছে ভালই, লালুদা!

ফেলুদা লালমোহনবাবুর দিকে ফিরে বলল, এঁকেও তা হলে এ বি সি ডি বলা চলে, তাই না?

কীরকম? চোখ কপালে তুলে জিজ্ঞেস করলেন জটায়ু।

এশিয়াজ বিজিয়েস্ট সিনেমা ডাইরেক্টর।